لا إله إلا الله محمد رسول الله

إن الدين عند الله الإسلام

পাক্ষিক আহ্‌মদী

THE AHMADI

Fortnightly

নব পর্যায়ে ৫৪ তম বর্ষ ।। ১৭ ও ১৮শ সংখ্যা

৭ই শাওয়াল, ১৪১৩ হিঃ ।। ১৭ই চৈত্র, ১৩৯৯ বাংলা ।। ৩১শে মার্চ, ১৯৯৩ইং

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ ৭২.০০ টাকা ।। ভারত ২ পাউণ্ড ।। অন্যান্য দেশ ১৫ পাউণ্ড ।।

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহমদী ১৭ ও ১৮শ সংখ্যা (৫৪তম বর্ষ) পৃঃ

তরজমাতুল কুরআন (সংক্ষিপ্ত তফসীর সহ)
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কর্তৃক প্রকাশিত কুরআন মজীদ থেকে ১

হাদীস শরীফ ঃ যাকাত ও দান-খয়রাত ৩

অমৃত বাণী ঃ হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)
অনুবাদ : জনাব নাজির আহমদ ভূঁইয়া ৫

জুমুআর খুত্‌বা
হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)
অনুবাদ : মাওলানা আবদুল আযীয সাদেক, সদর মুরব্বী ৯

ঈদুল ফিতরের খুতবা
হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী আল্‌-মুসলেহুল্‌-মাওউদ (রাঃ)
অনুবাদক : মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরব্বী ১৭

ঐশী প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হল
আলহাজ্জ এ, টি, চৌধুরী ২৮

বাংলাদেশী-সংসদে পাকিস্তানী কালো আইন
জনাব শহীদুল ইসলাম ৩১

হাজার ফতোয়া আর সরকারী ঘোষণা আহমদীদেরকে অমুসলিম বানাতে পারবে না
মোহতরম মোহাম্মদ মোস্তফা আলী, ন্যাশনাল আমীর ৩৪

যোগ্যতা
জনাব কে, এম, মাহমুদুল হাসান ৩৭

ওয়াকেফীনে নওদের বৈশিষ্ট্যাবলী ৪০

ছোটদের পাতা
পরিচালক : জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান ৪১
ছোটদের ডাইরী : জনাব মুহাম্মদ সেলিম খান ৪৬

সংবাদ ৪৮

সম্পাদকীয় ৫৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

৫৪তম বর্ষ : ১৭ ও ১৮শ সংখ্যা

৩১শে মার্চ, ১৯৯৩ : ৩১শে আমান, ১৩৭২ হিঃ শামসী : ১৭ই চৈত্র, ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ

কুরআন মজীদ

সূরা আল্‌-বাকারা—২

২৬১। এবং (স্মরণ কর সেই ঘটনাকেও) যখন ইব্‌রাহীম বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে দেখাও, কিরূপে তুমি মৃতকে জীবিত কর।' তিনি বলিলেন, 'তুমি কি ঈমান আন নাই'? সে বলিল, 'হ্যাঁ (ঈমান অবশ্যই আনিয়াছি), কিন্তু (প্রশ্ন এই জন্য করিয়াছি) যেন আমার হৃদয় প্রশান্তি লাভ (৩২৭) করিতে পারে।' তিনি বলিলেন, 'তুমি চারিটি পাখী লও এবং উহাদিগকে নিজের প্রতি পোষ মানাও। অতঃপর, তুমি উহাদের মধ্য হইতে এক এক অংশ (৩২৯) এক এক পাহাড়ের উপর রাখিয়া দাও, তারপর উহাদিগকে ডাক, তাহারা তোমার নিকট ছুটিয়া আসিবে।' এবং জানিয়া রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী, অতীব প্রজ্ঞাময়। ৩৫ রুকূ

৩২৭। 'ঈমান' ও 'ইতমিনান' এই দুইটি শব্দের অর্থ যথাক্রমে 'বিশ্বাস' ও 'হৃদয়ের প্রশান্তি'। ঈমানের অবস্থায় মানুষমাত্রই বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্‌ এইরূপ করিতে পারেন; আর ইতমিনানের অবস্থায় মানুষকে ব্যক্তিগতভাবে নিশ্চয়তা দেওয়া হয় যে, এইরূপ নিশ্চয় তোমার ক্ষেত্রেও করা হইবে। হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাস করিতেন যে, আল্লাহ্‌ তা'লা মৃতকে জীবিত করিতে পারেন (২:২৫৯)। কিন্তু তিনি আসলে যাহা চাহিয়াছিলেন তাহা হইল এই যে, তাঁহার নিজের বংশের বেলায়ও আল্লাহ্‌ তা'লা এহেন করিবেন কি? এই আয়াতের প্রতি ইশারা করিয়া মহানবী (সাঃ) বলিয়াছিলেন, হযরত "ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর চাইতে আমরাই সন্দেহের শিকার হইব বেশী" (মুসলিম)। 'শাক' শব্দটির তাৎপর্য হইল, মনের কোণে লুক্কায়িত বাসনার তীব্রতা ও ইহা পূরণের আগ্রহাতিশয্য। রসূলে করীম (সাঃ) কখনও এমনকি মুহূর্তের জন্যও আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি পূরণের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেন নাই। ইহাতে বুঝা যায় যে, হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর প্রশ্নটি সন্দেহ-উদ্ভূত ছিল না বরং মনের উদ্‌গ্রীবতা ও আগ্রহের গভীরতা দ্বারা প্রণোদিত হইয়াছিল।

২৬২। যাহারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে খরচ করে তাহাদের দৃষ্টান্ত এক শস্য-বীজের দৃষ্টান্তের ন্যায় যাহা সাতটি শীষ উৎপন্ন করে এবং প্রত্যেকটি শীষে একশত শস্যবীজ থাকে। এবং আল্লাহ্‌ যাহার জন্য চাহেন (ইহা অপেক্ষাও) বৃদ্ধি করিয়া দেন; নিশ্চয় আল্লাহ্‌ প্রাচুর্যদানকারী, সর্বজ্ঞানী (৩৩০)।

৩২৮। 'সুরতুল গুসনা ইলাইয়া' আমি শাখাটাকে আমার দিকে আকর্ষণ করিলাম (লেইন)। 'ইলা' অব্যয়টি 'সুরহুন্না' শব্দটির তাৎপর্য নির্দ্ধারণ করিতেছে যে, ইহা কাঁটা অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই বরং নিজের প্রতি অনুগত ও আকৃষ্ট করার অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

৩২৯। 'জুয' অর্থ কোনও বস্তুর অংশ বা ভাগ। অতএব, একটি বস্তু যদি একটি দল হয়, তাহা হইলে 'জুয' বলিতে ঐ দলের প্রত্যেক সদস্যকে বুঝায়। ইহা হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর একটি 'কাশ্‌ফ'। 'চারিটি পাখী লও' কথার মধ্যে ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে যে, হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর বংশধরেরা চারিবার উত্থান-পতনের সম্মুখীন হইবে। এই ঘটনা দুইবার ইস্‌রাঈলীদের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা হইবে এবং পুনরায় দুইবার আঁ হযরত (সাঃ) (যিনি হযরত ইসমাঈলের মাধ্যমে হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর বংশোদ্ভূত) ও তাঁহার অনুসারীদের মধ্যে। ইহুদীগণ (যাহারা হযরত ইস্‌হাকের মাধ্যমে হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর বংশ) দুইবার ধ্বংসের সম্মুখীন হয়—প্রথমবার নবুখদনিৎসরের হাতে এবং দ্বিতীয়বার টাইটাসের হাতে (১৭ : ৫-৮ এনসাই বৃট, যিউ শীর্ষক অধ্যায়)। প্রত্যেক বারই আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহাদিগকে অধঃপতনের পর পুনরুদ্ধার করেন। দ্বিতীয়বারে পুনরুদ্ধার ঘটে, রোম সম্রাট কনষ্ট্যান্টাইনের দ্বারা যিনি স্বয়ং খৃষ্ট-ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনুরূপভাবে, মুসলমানদের শৌর্যবীর্য দুর্দ্ধর্ষ তাতার বর্বরদের হাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় আর মুসলমানদের কেন্দ্রভূমি বাগদাদ নগরীতে তাতার-রাজ হালাকু খানের নৃশংস নরহত্যার হোলি খেলা সংঘটিত হয়। তবে মুসলমানেরা শীঘ্রই এই ধ্বংসলীলা হইতে উদ্ধার লাভ করে। বিজয়ীরাই বিজিত হইয়া যায় এবং হালাকু খানের পৌত্র ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে পিতামহের হত্যালীলার প্রায়শ্চিত্ত করেন। ইসলামের দ্বিতীয় পতন ঘটে এই আখেরী যামানাতে যখন সার্বিকভাবে এবং সাধারণভাবে মুসলমানেরা নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং রাজনৈতিক দিক হইতে অধঃপতিত হইয়া পড়িয়াছে। প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ)-এর মাধ্যমে ইসলামের পুনর্জাগরণ ও বিশ্ববিজয়ের কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

৩৩০। পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে বলা হইয়াছে, ইহাই আল্লাহ্‌তা'লার নিয়ম যে, উপযুক্ত জাতিগণ মৃতবৎ অধঃপতনের পরেও আল্লাহ্‌র অনুগ্রহক্রমে পুনর্জীবন লাভ করে এবং বনী ইসরাঈল জাতির দৃষ্টান্ত দিয়া তাহা বুঝানো হইয়াছে। এই কথার প্রতিও ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর বংশ চারিবার উত্থান-প্রাপ্ত হইবে, ইসরাঈলীগণ দুইবার এবং ইসমাঈলীগণ দুইবার। মুসলমানের অধঃপতনের পরও যাহাতে প্রতিশ্রুত উত্থান লাভ করিতে পারে, ইহারউপায় হিসাবে, আল্লাহ্‌তা'লা মুসলমানকে আল্লাহ্‌র পথে জান-মাল, টাকা-পয়সা ও ধনদৌলত খরচ করার জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানাইয়াছেন।

হাদিস শরীফ

যাকাত ও দান-খয়রাত

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, নবী (সাঃ) মু'আযকে ইয়ামেনে প্রেরণ করেন এবং তাঁকে বলেন, 'তুমি তাদেরকে এই সাক্ষ্য দিতে আহ্বান করবে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই এবং আমি আল্লাহ্র রসূল। যদি তারা ইহা মানে তবে তাদিগকে অবগত করাবে যে, প্রত্যেক দিবারাত্রে আল্লাহ্ তাদের ওপর পাঁচ (বার) নামায ফরয করেছেন। যদি তারা ইহাও মানে তবে তাদিগকে জ্ঞাত করাবে যে, আল্লাহ্ তাদের ধন-সম্পত্তিতে যাকাত ফরয করেছেন, উহা তাদের ধনীদের নিকট হতে সংগৃহীত হয়ে তাদের দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করা হবে। (বুখারী)

হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সৎ উপার্জন হতে একটি খেজুর পরিমাণ দান করে—আর আল্লাহ্ তো পবিত্র বস্তু ব্যতীত অন্য কিছুই কবুল করেন না—আল্লাহ্ উহা স্বীয় দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করেন; তৎপর তিনি দানকারীর জন্যে উহা পরিপোষণ করেন, যেভাবে তোমাদের কেউ স্বীয় অশ্বশাবক পরিপোষণ করে; অবশেষে উহা (দান) পাহাড় সদৃশ হয়ে যায়।' (বুখারী)

হযরত হারিসা ইব্নে ওয়াহাব (রাঃ) বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'তোমরা দান কর, কেন-না তোমাদের এমন এক সময় আসবে যখন কোন লোক স্বীয় যাকাত নিয়ে ঘুরতে থাকবে অথচ উহা গ্রহণ করবে এইরূপ কাকেও খুঁজে পাবে না। লোকে বলবে, যদি গতকাল উহা আনতেন অবশ্যই আমি উহা গ্রহণ করতাম; কিন্তু আজ আমার আর উহার কোন প্রয়োজন নেই।' (বুখারী)

হযরত আবু মাস'উদ আনসারী (রাঃ) বলেছেন, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন আমাদেরকে দান করবার আদেশ করতেন তখন আমাদের কেউ কেউ বাজারে চলে যেত এবং মোট বহন করে এক 'মুদ্দ' (অর্থাৎ প্রায় ১ সের) মজুরী পেত এবং উহা (হতে) দান করত; আর আজ তাদের কেউ কেউ লক্ষপতি'। (বুখারী)

হযরত 'আয়শা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সাঃ)-এর কোন সহধর্মিণী নবী (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আমাদের মধ্যে কে সর্বাগ্রে (মৃত্যুর পর) আপনার সাথে মিলিত হবে?' তিনি উত্তর করলেন, 'তোমাদের মধ্যে যে সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ-হস্ত।' তখন তাঁরা

একটি কাঠি নিয়ে হাত মেপে দেখল, সওদা তাদের মাধ্য দীর্ঘ-হস্ত। পরে (সর্বপ্রথম যয়নবের মৃত্যু হলে) আমরা বুঝতে পারলাম যে, হস্তের দীর্ঘতা হল দানশীলতা। তিনি (যয়নব) আমাদের মধ্যে সর্বাগ্রে তাঁর সাথে মিলিত হন এবং তিনি দান করতে ভালবাসতেন।' (বুখারী)

হযরত হাকীম ইবনে হিযাম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নবী (সাঃ) বলেছেন, 'উপরের হাত নীচের হাত হতে উৎকৃষ্ট। তোমার পোষ্যকে ধরেই (দান) শুরু কর। অভাবযুক্ত থেকে দান করাই উত্তম দান। যে (যাচ্ঞা হতে) পবিত্র থাকতে চায়, আল্লাহ্ তাকে (উহা হতে) পবিত্র রাখেন এবং যে অভাবমুক্ত থাকতে চায় আল্লাহ্ তাকে অভাবমুক্ত রাখেন।' (বুখারী)

হযরত আস্মা বিন্তে আবুবকর (রাঃ) বলেন, নবী (সাঃ) আমাকে বলেছেন, 'বেঁধে রেখোও না (দান না করে) তাহলে তোমার পক্ষেও (না দিয়ে) বেঁধে রাখা হবে।' (বুখারী)

হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নবী (সাঃ) বলেছেনঃ "প্রত্যেক দিন ভোরে যখন বান্দাগণ প্রাত্রোত্থান করে, দু'জন ফিরিশ্তা অবতরণ করে। তাদের একজন বলতে থাকে, 'হে আল্লাহ্! দাতাকে পুরস্কার দান করো; এবং অপরজন বলতে থাকে, হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস করো।' (বুখারী)

হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ তোমাদের কাহারও পক্ষে একগাছা রজ্জু নিয়ে বের হওয়া এবং কাষ্ঠ সংগ্রহ করতঃ পিঠে বহন করে আনা ইহা অপেক্ষা উত্তম যে, সে কোন ব্যক্তির নিকট গিয়ে তার কাছে ভিক্ষা চাইবে, সে হয়ত তাকে দান করবে অথবা তাকে বিমুখ করবে।' (বুখারী)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে 'উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি বরাবর লোকের নিকট ভিক্ষা করতে থাকে সে কিয়ামতের দিন এমতাবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তার মুখমণ্ডলে সামান্য মাংসও থাকবে না।' তিনি আরও বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন সূর্য নিকটবর্তী হবে, এমন কি ঘাম কানের মধ্যভাগে পৌঁছবে। এমত অবস্থায় সকলে আদম (আঃ), তৎপর মূসা (আঃ) এবং তৎপর (শেষে) মুহাম্মদ (সাঃ) এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবে।' (বুখারী)

হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর
অমৃতবাণী

অনুবাদক : নাজির আহমদ ভুঁইয়া

(১৬শ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

প্রকাশ থাকে যে, এইরূপ অনেক লোক আছে যাহাদিগকে যালেম ব্যক্তিরা হত্যা করিয়া থাকে। তাহাদিগকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হয়। তাহাদিগকে পানিতে ডুবাইয়া দেওয়া হয়। যদি তাহারা পুণ্যবানও হয় তথাপি খোদাতা'লার পক্ষ হইতে তাহাদের নিকট কোন সাহায্য পৌঁছে না। আবার কোন কোন লোক এইরূপ আছে যাহাদের স্ত্রীদের সহিত বজ্জাত ব্যক্তিরা বলপূর্বক ব্যভিচার করে। আবার কোন কোন লোক এইরূপ আছে যাহাদের সন্তান পানি পিপাসায় ধুঁকিয়া ধুঁকিয়া প্রাণ ত্যাগ করে এবং তাহাদের জন্য অদৃশ্য হইতে কোন 'আবে যমযম' সৃষ্টি হয় না। সুতরাং ইহা হইতে বুঝা যায় যে, খোদাতা'লা প্রত্যেকের সহিত সম্পর্ক অনুযায়ী আচরণ করিয়া থাকেন। যদিও খোদাতা'লার প্রিয়জনদের উপরও দুঃখ কষ্ট আপতিত হয়, কিন্তু তাহাদের জন্য খোদার সাহায্য প্রকাশ্য-ভাবে উপস্থিত হয়। খোদার আত্মাভিমান কখনো ইহা বরদাশ্‌ত করে না যে, তাহারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হউন। তাঁহার ভালবাসা ইহা বরদাশ্‌ত করে না যে, তাহাদের নাম পৃথিবী হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাক।

অলৌকিকতার গূঢ় রহস্যও ইহাই যে, যখন মানুষ নিজের সমস্ত সত্তাসহ খোদার হইয়া যায় এবং তাহার ও তাহার প্রভুর মধ্যে কোন পর্দা থাকে না এবং সে বিশ্বস্ততা ও সততার সকল ধাপ অতিক্রম করে যাহা পর্দার আড়ালে থাকে, তখন সে খোদার ও তাঁহার কুদরতসমূহের উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হইয়া যায় এবং খোদাতা'লা তাহার জন্য বিভিন্ন প্রকারের নিদর্শন প্রকাশ করেন, যাহার কোন কোনটি মন্দ দূর করে ও কোন কোনটি কল্যাণ পৌঁছায়। কোন কোন নিদর্শন তাহার নিজের সহিত সম্পৃক্ত হয়। কোন কোনটি তাহার পরিবার পরিজন সম্পর্কিত হয়। কোন কোনটি তাহার শত্রু সম্পর্কিত হয়। কোন কোনটি তাহার বন্ধু সম্পর্কিত হয়। কোন কোনটি তাহার দেশবাসী সম্পর্কিত হয়। কোন কোনটি সার্বজনীনতা সম্পর্কিত হয়। কোন কোনটি পৃথিবী সম্পর্কিত ও কোন কোনটি আকাশ সম্পর্কিত হয়। মোট কথা এমন কোন নিদর্শন নাই, যাহা তাহার জন্য দেখানো হয় না এবং ইহা কোন দুঃসাধ্য বিষয় নহে। এখানে কোন বিতর্কের প্রয়োজন নাই। কেন-না

বর্ণনা মোতাবেক যদি প্রকৃত পক্ষে কোন ব্যক্তির এই তৃতীয় স্তর লাভের সৌভাগ্য হয় তবে দুনিয়া কখনো তাহার মোকাবেলা করিতে পারে না। যে তাহার উপর পতিত হইবে সে টুকরা টুকরা হইয়া যাইবে এবং সে যাহার উপর পতিত হইবে সেও চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে কেন-না তাহার হস্ত খোদার হস্ত এবং তাহার মুখ খোদার মুখ। তাহার অবস্থান পর্যন্ত কেহ পৌঁছিতে পারে না। ইহা বলা বাহুল্য যে, যদিও অধিকাংশ লোকের (যাহারা ধনী) নিকট দিরহাম ও দিনার (অর্থাৎ অর্থ সম্পদ—অনুবাদক) থাকে, কিন্তু যদি তাহারা ধৃষ্টতাপূর্বক বাদশাহের মোকাবেলা করে, যাহার ধনসম্পদ পূর্ব ও পশ্চিমে বিস্তৃত, তবে এইরূপ মোকাবেলার পরিণতি লাঞ্ছনা ছাড়া আর কি হইবে? এইরূপ ব্যক্তিরা ধ্বংস হইবে এবং তাহাদের সামান্য পরিমাণ দিরহাম ও দিনারও বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

খোদার নাম পরাক্রমশালী। তিনি স্বীয় সম্মান কাহাকেও দেন না; কেবল তাহাদিগকেই দেন যাহারা তাঁহার জন্য একাকী ও নিঃসঙ্গ হইয়া যায় এবং তাঁহার প্রেমে এই রূপে বিলীন হইয়া পড়ে যে, তাঁহার গুণাবলীর স্থলাভিষিক্ত হইয়া যায় তাহারা ব্যতীত তিনি অন্য কাহারো নিকট নিজেকে প্রকাশ করেন না। স্বীয় জ্যোতিঃ হইতে তিনি তাহাদিগকে জ্যোতিঃ দান করেন। স্বীয় জ্ঞান হইতে তিনি তাহাদিগকে জ্ঞান দান করেন। তখন তাহারা নিজেদের সমগ্র মন প্রাণ ও ভালবাসা দ্বারা সেই নিঃসঙ্গ বন্ধুর উপাসনা করে এবং তাঁহার সন্তুষ্টি এইভাবে চাহে যেভাবে তিনি নিজেই চাহেন।

মানুষ খোদার উপাসনার দাবী করে। কিন্তু কোন্ উপাসনা। কেবলমাত্র অনেক সেজদা, রুকু ও কেয়াম দ্বারা কি এই উপাসনা হয়? অথবা যাহারা অনেকবার তসবীহের দানা টিপে তাহাদিগকে কি খোদা-প্রেমিক বলা যাইতে পারে? বরং উপাসনা তাহার দ্বারা হইতে পারে যাহাকে খোদার ভালবাসা এই পর্যায়ে নিজের প্রতি আকর্ষণ করে যে, তাহার নিজের সত্তা মধ্য হইতে উঠিয়া যায়। প্রথমতঃ খোদার অস্তিত্বের উপর পূর্ণ বিশ্বাস থাকিতে হইবে। অতঃপর খোদার সৌন্দর্য ও দয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবহিত হইতে হইবে। এতদ্ব্যতীত তাঁহার সহিত ভালবাসার সম্পর্ক এইরূপ হইতে হইবে যেন প্রেমের বেদনা সর্বদা হৃদয়ে বিরাজ করে এবং এই অবস্থা প্রতি মুহূর্তে চেহারায় বিকশিত হয়। খোদার মহিমা হৃদয়ে এইরূপে থাকিতে হইবে যেন সমগ্র বিশ্ব তাঁহার সত্তার সম্মুখে মৃত সাব্যস্ত হয়। প্রতিটি ভীতি তাঁহার সত্তার সহিত সম্পৃক্ত হইতে হইবে। তাঁহার বিরহ-বেদনায় স্বাদ লাভ করিতে হইবে। তাঁহার সহিত নিঃসঙ্গতায় স্বস্তি লাভ করিতে হইবে। তিনি ব্যতীত অন্য কাহারো নিকট হৃদয়ের শান্তি পাওয়া যাইবে না। যদি অবস্থা এইরূপ হইয়া যায় তবে ইহার নাম উপাসনা। কিন্তু খোদাতা'লার বিশেষ সাহায্য ছাড়া এই অবস্থার সৃষ্টি হয় না। এই জন্য খোদাতা'লা এই দোয়া শিখাইয়াছেন:

اياك نعبد واياك نستعين ٥

অর্থাৎ আমরা তোমার উপাসনা তো করি। কিন্তু তোমার পক্ষ হইতে বিশেষ সাহায্য না পাইলে আমরা কখনো উপাসনার হক্ আদায় করিতে পারি না। খোদাকে নিজের প্রকৃত প্রেমিক সাব্যস্ত করিয়া তাঁহার উপাসনা করাই বন্ধুত্ব। ইহার পর আর কোন স্তর নাই। কিন্তু তাঁহার সাহায্য ছাড়া এই স্তর লাভ করা যায় না। ইহা লাভ করার চিহ্ন এই যে, খোদার মহিমা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইবে, খোদার প্রেম হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইবে, অন্তর তাঁহার উপর ভরসা করিবে, তাঁহাকে পসন্দ করিবে, সকল কিছুর উর্ধ্বে তাঁহাকে প্রাধান্য দিবে এবং তাঁহার স্মরণকেই জীবনের উদ্দেশ্য মনে করিবে। যদি ইব্রাহীমের ন্যায় নিজের হাতে নিজ প্রিয় পুত্রকে যবাই করার আদেশ হয়, বা নিজেকে আগুনে ফেলার জন্য ইঙ্গিত হয় তবে এইরূপ কঠোর আদেশকেও ভালবাসার আবেগে পালন করিবে এবং স্বীয় প্রিয় প্রভুর সন্তুষ্টির জন্য এতখানি সচেষ্ট হইতে হইবে যাহাতে তাঁহার আনুগত্যে কোন ফাঁক না থাকে। ইহা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ দরজা এবং ইহা খুবই তিক্ত শরবত। অল্প লোকই এই দরজা দিয়া প্রবেশ করে এবং এই শরবত পান করে। ব্যভিচার হইতে বাঁচা কোন বড় ব্যাপার নহে এবং কাহাকেও অন্যায়ভাবে হত্যা না করা বড় কাজ নহে। মিথ্যা সাক্ষ্য না দেওয়াও কোন বড় গুণ নহে। কিন্তু সব কিছুর উপর খোদাকে প্রাধান্য দেওয়া এবং তাঁহার জন্য খাঁটি ভালবাসা এবং খাঁটি আবেগে পৃথিবীর সকল তিক্ততা স্বীকার করা বরং নিজের হাতে তিক্ততা সৃষ্টি করা ঐ মর্যাদা, যাহা সত্যবাদী ছাড়া অন্য কেহ অর্জন করিতে পারে না। এই ইবাদত সম্পাদনের জন্যই মানুষ প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছে। যে ব্যক্তি এই ইবাদত সম্পাদন করে তাহার এই কর্মের জন্য খোদার পক্ষ হইতেও একটি কর্ম নির্ধারিত হয়। ইহার নাম পুরস্কার, যেমন আল্লাহ্‌তা'লা কোরআন শরীফে বলেন, অর্থাৎ এই দোয়া শিখাইতেছে اهدنا الصراط المستقيم ٥ صراط الذين انعمت عليهم ٥ (সূরা ফাতেহা : ৬-৭) অর্থাৎ হে আমার খোদা। আমাদিগকে সরল-সুদৃঢ় পথ দেখাও, ঐ সকল লোকের পথ যাহাদিগকে তুমি পুরস্কৃত করিয়াছ এবং তোমার বিশেষ অনুগ্রহে ভূষিত করিয়াছ। আল্লাহ্‌র বিধান এই যে, যখন খেদমত গৃহীত হইয়া যায় তখন উহার উপর নিশ্চিতভাবে কোন পুরস্কার নির্ধারিত হয়। বস্তুতঃ ব্যতিক্রম ও নিদর্শনও খোদাতা'লার পুরস্কার যাহার নিদর্শন অন্য লোকেরা পেশ করিতে পারে না।' ইহা বিশেষ বান্দাগণকে দেওয়া হয়।

اے گرفتار ہوا در ہمہ اوقات حیوۃ   باچنیں نفس سیہ چوں رسدت زندہ ونے
گر تواں صدق و برزی کہ بورزید کلیم   عجبے نیست اگر غرق شود فرعونے

(উপরের ফারসী কবিতার অর্থ: "হে কাম-ক্রোধ বন্দী, সারা জীবন এমনি করিয়া কাটাইলে ; সত্য-সংস্থাপক [মূসা] কলিমের নির্ধারিত পন্থা অবলম্বন না করিয়া শেষকালে এক কলুষ আত্মা "সউমের" প্ররোচনায় কি-না (মূসা) কলিমুল্লাহ্‌কে ধাওয়া করিয়া চলিলে ? হায়রে নরাধম ফেরাউন, যদিবা তুমি সাগর জলে ডুবো ডুবো হইয়া পড় তাহা হইলে আশ্চর্যের কিছু নাই।")

যাহাহউক এই সকল কথার সারাংশ এই যে, তৃতীয় স্তর ছাড়া কেহ পাক পবিত্র ওহীর পুরস্কার লাভ করিতে পারে না। এই পুরস্কার লাভকারীগণ ঐ সকল লোক যাহারা

নিজেদের অস্তিত্ব হইতে মরিয়া যান, খোদাতা'লার নিকট হইতে এক নূতন জীবন লাভ করেন এবং নিজেদের প্রবৃত্তি সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া খোদাতা'লার সহিত পূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেন। তখন তাহাদের সত্তা খোদার জ্যোতির বিকাশস্থল হইয়া পড়ে এবং খোদা তাহাদিগকে ভালবাসেন। তাহারা নিজদিগকে যতই গোপন করিতে চাহেন না কেন, খোদা-তা'লা তাহাদিগকে প্রকাশ করিতে চাহেন এবং তাহাদের নিকট হইতে ঐ নিদর্শন প্রকাশিত হয়, যদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, খোদাতা'লা তাহাদিগকে ভালবাসেন। পৃথিবী কোন বিষয়ে তাহাদের মোকাবেলা করিতে পারেনা। কেন-না প্রত্যেক রাস্তায় খোদা তাহাদের সাথে থাকেন এবং প্রত্যেক ময়দানে খোদার হাত তাহাদিগকে সাহায্য করে। হাজার হাজার নিদর্শন তাহাদের সাহায্য ও সমর্থনে প্রকাশিত হয়। যাহারা তাহাদের বিরুদ্ধে শত্রুতা হইতে বিরত হয় না তাহাদিগকে পরিণামে বড়ই লাঞ্ছনার সহিত ধ্বংস করা হয়। কেন-না খোদার নিকট তাহাদের শত্রু খোদার শত্রু। খোদা দয়ালু। তিনি ধীরে কর্ম সম্পাদন করেন। কিন্তু যাহারা তাহাদের বিরুদ্ধে শত্রুতা হইতে বিরত হয় না এবং জানিয়া বুঝিয়া তাহাদিগকে কষ্ট দেওয়ার জন্য সদা প্রস্তুত থাকে, খোদা তাহাদের মূল উৎপাটনের জন্য এইরূপে হামলা করেন, যেইরূপে একটি বাঘিনী (যখন কেহ উহার বাচ্চাকে মারার ইচ্ছা করে) ক্রোধ ও উত্তেজনার সহিত তাহার উপর হামলা করে এবং তাহাকে টুকরা টুকরা না করা পর্যন্ত ক্ষান্ত হয় না। খোদার প্রিয়জনদিগকে টুকরা না করা পর্যন্ত ক্ষান্ত হয় না। খোদার প্রিয়জনদিগকে এবং বন্ধুদিগকে এইরূপ বিপদের সময়েই সনাক্ত করা হইয়া থাকে। যখন কেহ তাহাদিগকে দুঃখ দিতে চাহে এবং এই ব্যাপারে জিদ ধরে এবং ইহা হইতে বিরত হয় না তখন খোদা তাহার উপর বিদ্যুতের ন্যায় পতিত হন এবং তুফানের ন্যায় তাহাকে নিজের ক্রোধের গণ্ডিভুক্ত করেন। খোদা খুব শীঘ্র প্রকাশ করিয়া দেন যে, তিনি তাঁহাদের সঙ্গে আছেন। যেভাবে তোমরা দেখ যে, সূর্যের আলো ও রাত্রির প্রদীপের আলোর মধ্যে কোন তুলনা হয় না, তদ্রূপে যে জ্যোতিঃ তাহাদিগকে দেওয়া হয় এবং যে নিদর্শন তাহাদের জন্য প্রকাশ করা হয় এবং যে আধ্যাত্মিক পুরস্কার তাহাদিগকে দান করা হয়, এইগুলির সহিত অন্য কিছুর তুলনা হয় না। তাহাদের দৃষ্টান্ত কোন ব্যক্তির মধ্যে দেখা যায় না। খোদা তাহাদের উপর অবতীর্ণ হন। তাহাদের হৃদয় খোদার আরশ হইয়া যায়। তাহারা অন্য কিছুতে পরিণত হন, যাহার প্রান্তসীমা পর্যন্ত জগদ্বাসী পৌঁছিতে পারে না।

প্রশ্ন এই যে, খোদা তাহাদের সহিত এইরূপ সম্পর্ক কেন রাখেন? ইহার উত্তর এই যে, খোদা মানুষের প্রকৃতি এইরূপ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন যে, সে এইরূপ একটি পাত্রের ন্যায় যাহা কোন প্রকাশের ভালবাসা হইতে শূন্য থাকিতে পারে না। ইহা শূন্য থাকা অসম্ভব। অতএব যখন কোন হৃদয় এইরূপ হইয়া যায় যে, ইহা প্রবৃত্তির ভালবাসা, প্রবৃত্তির কামনা, বাসনা, পৃথিবীর ভালবাসা এবং ইহার আশা আকাঙ্খা হইতে সম্পূর্ণরূপে শূন্য হইয়া পড়ে এবং জাগতিক ভালবাসার পঙ্কিলতা হইতে পবিত্র হইয়া যায়, তখন খোদা-তা'লা সৌন্দর্যের জ্যোতিসহ স্বীয় ভালবাসা দ্বারা এইরূপ হৃদয়কে পূর্ণ করিয়া দেন। তখন জগদ্বাসী তাহার সহিত শত্রুতা করে। কেন-না জগদ্বাসী শয়তানের ছত্রছায়ায় চলাফেরা করে। সে জন্য তাহারা সত্যবাদীকে ভালবাসিতে পারে না। কিন্তু খোদা তাহাদিগকে একটি শিশুর ন্যায় নিজের স্নেহের আঁচলে আশ্রয় দেন এবং তাহাদের জন্য এইরূপ খোদায়ী শক্তি দেখান যাহার দরুন প্রত্যেক দর্শকের চোখে খোদার চেহারা দৃষ্টিগোচর হয়। সুতরাং তাহাদের অস্তিত্বে খোদার বিকাশ ঘটে। ইহাতে জানা যায় যে, খোদা আছেন। (ক্রমশঃ)

(হাকিকাতুল ওহী পুস্তকের ধারাবাহিক অনুবাদ)

জুমু'আর খুতবা

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[৭ই আগষ্ট, ১৯৯২ তারিখ লণ্ডনের মসজিদে ফযলে প্রদত্ত]

অনুবাদ : মাওলানা আবদুল আযীয সাদেক,
সদর মুরব্বী

(১৬শ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

বুঝা গেল প্রথমে বাহানা তালাশ করা হয়, তারপর মিথ্যা আরম্ভ হয়। আসলে বাহানা অনেক সময় মানুষের দৃষ্টি হতে এমনভাবে অগোচরে থাকে, সে বুঝতেই পারে না যে, এই বাহানা এক সময় মিথ্যার বাচ্চা জন্ম দিবে ; যেমনভাবে বিছা অন্ধকারে বড় হতে থাকে এক সময়ে ঐগুলি প্রজাপতিতে পরিণত হয়ে যায়। প্রজাপতি তো পাখনায় উড়ে বেড়ায় কিন্তু মিথ্যার বিছা পাখনা বিহীন উড়ে বেড়ায় এবং সম্পূর্ণ সমাজে ব্যাপকভাবে ঘৃণা ও ময়লা বিস্তার করে। খুব স্মরণ রাখবেন যে, এটা হতেই পারে না যে, আপনি মিথ্যাবাদী হয়েও খোদার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবেন। মিথ্যাবাদীর সম্পর্ক মিথ্যার সাথেই হবে। তাই মিথ্যাবাদীর স্বপ্নেরও কোন বিশ্বাস নেই। যখন কোন ব্যক্তি আমাকে স্বপ্ন শুনায় তখন সর্বদা আমার দৃষ্টি থাকে এ বিষয়ের উপর যে, তার স্বভাব কোন্ প্রকারের। যদি সে সত্যবাদী ও নিষ্কলুষ মানুষ হয়ে থাকে, তাহলে তার স্বপ্নকে আমি অনেক গুরুত্ব প্রদান করে থাকি যদিও স্বপ্নটি সরল হউক না কেন ; কিন্তু উহাতেও অনেক সময় বড় গভীর পয়গাম নিহিত থাকে। কিন্তু যার দৈনন্দিন জীবনের অভ্যেসই হয় মিথ্যা কথা বলা এবং বৃথা কার্যকলাপের মধ্যে জীবন যাত্রা করা ; তাহলে সে যে স্বপ্নই দেখবে উহাতে তার মনের ইচ্ছা-আকাঙ্খাই প্রতিফলিত হবে ; খোদার সংগে তার কমই সম্পর্ক হবে। একথা অবশ্য বলা যায় না যে, মিথ্যোবাদী সত্য স্বপ্ন দেখতে পাবে না ; সেও দেখতে পারে, কিন্তু কদাচিৎ। মিথ্যা স্বপ্নই সে বেশী দেখে। সত্যবাদীগণ বেশীর ভাগ সত্য স্বপ্নই দেখে থাকেন। তাই আল্লাহ্র সংগে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য মিথ্যা কথা বলা অবশ্যই পরিহার করতে হবে, তাহলেই আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন হবে।

কিছু মিথ্যা কথা এমনও আছে যা কোন ব্যক্তি নিজ আত্মার জন্য নয় বরং স্বার্থ সিদ্ধির জন্য বলে থাকে, যেরূপে আমি পূর্বে দৃষ্টান্ত দিয়েছিলাম যে কোন সময় সম্মুখে কোন ফায়দা হাসিল করার বিষয় থাকে তখন সত্যকথা বললে যদি উপকার লাভ না হয় তখন সাধারণতঃ মানুষ বিনা দ্বিধায় মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে। মিথ্যার এ যে প্রকারটি, ইহা

কোন কোন সময় মানুষের জীবনে গভীরভাবে তিক্ততা সংমিশ্রিত করে বিশেষ করে যখন বিয়ে শাদীর বিষয় সম্মুখে থাকে। তাইতো কুরআন করীম বিয়ে শাদী উপলক্ষ্যে পঠনীয় আয়াত-সমূহে "কওলে সাদীদ" পোষণ করার জন্য বিশেষভাবে আদেশ প্রদান করা হয়েছে। "কওলে সাদীদ" এর মর্ম এই নয় যে, সত্য কথা বল, কওলে সাদীদের মর্ম এই যে, এমনভাবে সত্য কথা বল যাতে কোন রকমের ভুলবুঝাবুঝির সম্ভাবনাও সৃষ্টি না হতে পারে। কোন কোন সময় মানুষ সত্য কথা বলে কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ভুলভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। কোন কোন কথাকে তো গোপন করে ফেলে, যেগুলি সে উল্লেখই করে না। অথচ 'কওলে সাদীদ" এর শর্তসহ এ শর্তও রয়েছে যে, প্রত্যেক এমন বিষয় উল্লেখ কর যা উল্লেখ করা জরুরী, যাতে কোন রকম ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি না হয়।

আমি বিয়ে-শাদীর ঝগড়া-বিবাদে প্রায়ই দেখেছি যে, "কওলে সাদীদ" এর অভাবই সবচাইতে বেশী ক্ষতির কারণ হয়। এরপর ঐ সকল লোক থাকে যারা তাহা মিথ্যার ভিত্তিতে কার্য পরিচালনা করে। তাদের বিয়ে-শাদীর সকল বিষয়ই শয়তানী সম্পর্ক হতে আরম্ভ হয়; তাদের নিকট হতে কোন বিষয়ের আশাই করা যায় না। কোন কোন মা তার সন্তানের জন্য বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে মেয়ে খুঁজে বেড়ায় এবং যদিও দু' পয়সাও উপার্জন করে না তবু পিতার সম্বন্ধে বলে বেড়ায় যে, সে অমুক জায়গায় দশ হাজার টাকা মাসে উপার্জন করে এত তার সম্মান, এই তার বংশ ইত্যাদি। কোন সময় কথা বলা হয় এক ছেলে সম্পর্কে আর বিয়ে দেয়া হয় অন্য ছেলের সংগে। কোন সময় কথাবার্তা হয় এক মেয়ের সম্পর্কে এবং বিয়ে দেয়া হয় অন্য এক মেয়েকে। মিথ্যা, প্ররোচনা, প্রঞ্চনা, এবং নোংরামি এমন এক হেয় ও লাঞ্ছিত সমাজ সৃষ্টি করে যার প্রতি তাকাতেও ঘৃণা বোধ হয়। এই হল ঐ সকল লোক যারা (যদিও সংখ্যায় অনেক অল্প কিন্তু কিছু সংখ্যক এইরূপ আছে যারা) নিজেকে আহমদী বলে পরিচয় দিতে গৌরব বোধ করে। এইভাবে তারা প্রবঞ্চনা, ধোকাবাজী এবং মিথ্যার উপর ভিত্তি করে সম্পর্ক স্থাপন করে; পরে যখন আশা-আকাংখা পূর্ণ হয় না তখন তারা খোঁটা দিয়ে এইরূপও বলে যে, দেখ কেমন আহমদী। তারা আমাকে ভর্ৎসনা করে বলে, অমুক জায়গায় আহমদী মনে করে বিয়ে দিয়েছিলাম কিন্তু পরে এমনটি হল। আবার কোন সময় তাদেরকে বলতে বাধ্য হই যে, আপনারা মিথ্যা কথা বলেছেন; আপনারা তাদিগকে আহমদী মনে করে আদৌ বিয়ে করেননি, আহমদী পুণ্যবান মনে করে কাজ করেননি। আপনারা অমুক লোভে বিয়ে করেছেন; এখন এ লোভই উল্টো হয়ে আপনাদের ঘাড়ে চেপে বসেছে। আপনারা নিজদিগকে উল্টোর পরিবর্তে আহমদীয়াতকে উল্টাতে আরম্ভ করেছিলেন এবং মনে করেছেন যে, সকল দায়-দায়িত্ব এখন আমার উপর ন্যস্ত করবেন; এখন আপনাদের ভুলত্রুটির শাস্তি আমাকে নিজে অথবা জামা'তকে ভোগ করতে হবে। আপনারা কোনরূপে এ বিপদ হতে নিষ্কৃতি

পেতে পারেন। বিয়ে-শাদী সংক্রান্ত যে-সব কলহ-বিবাদ আমার নিকট পৌঁছেছে ঐগুলি পর্যালোচনা করে দেখা গিয়েছে যে, কয়েকটি ব্যতিরেকে সবগুলির গোড়াতেই অবশ্য মিথ্যার নোংরামি সংমিশ্রিত থাকে অথবা 'কওলে সাদীদ' হতে বিচ্যুতি অবশ্যই থাকে। কওলে সাদীদে এ শর্তও আছে যে, যার কন্যা নিতে যাচ্ছো তিনি জিজ্ঞেস করুন বা না করুন, তাঁকে অবশ্যই বলতে হবে যে, ছেলের মধ্যে এই ত্রুটি আছে। তদ্রূপই কওলে সাদীদে এ শর্তও আছে যে, কন্যার মধ্যে কোন দোষত্রুটি থাকলে ভাবি স্বামীকে বা তারি আত্মীয়স্বজনকে পরিষ্কারভাবে বলে দিতে হবে যে, কন্যার মধ্যে এ দোষত্রুটি আছে, আপনারা তা দেখে নিন। এরপরও যদি তারা গ্রহণ করে নেয় তাহলে আর কোন অভিযোগ হতে পারে না।

যারা "কওলে সাদীদ" এর ভিত্তিতে কাজ করেন তাদের বিয়ে-শাদী আল্লাহ্‌র ফযলে সর্বদাই সফল হয়। কতকগুলি এমন দম্পতি সম্বন্ধে আমার জানা আছে, যাদের সম্মুখে পরস্পরের দোষত্রুটি পরিষ্কার করে বলে দেয়া হয়েছিল, ইহা সত্ত্বেও তারা গ্রহণ করে নিল। খোদার ফযলে তারা পরম মধুর ও সুখী দম্পতিরূপে জীবন যাত্রা করছে এবং পবিত্র পরিবেশ তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি এখানে আমাদের পাশ্চাত্য সমাজে কোন কোন অবলা কিশোরী এমনও আছে যারা নোংরা পরিবেশে জড়িত হয়ে যায়। বাইরে থেকে আগত কেউ তাদের মধ্যে কাউকেও বিয়ে করার ইচ্ছে প্রকাশ করাতে তাদের পক্ষ হতে বলে দেয়া হল যে, এই দুর্বলতা আমাদের দ্বারা হয়েছে; এখন তোমাদের ইচ্ছা হলে বিয়ে কর। তখন কেউ কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করলো; আমি তাদিগকে বললাম যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "আত্‌তায়েবো মিনায্‌যান্‌বে কামান্‌ লা যাম্‌বা লাহু" অর্থাৎ পাপ হতে যারা তওবা (অনুতাপ ও অনুশোচনা) করে তারা তার মত যার কোন পাপ নেই। একদিকে তোমরা ইসলামের সৌন্দর্য জগতের সম্মুখে তুলে ধর এবং অপর দিকে এক ব্যক্তি স্পষ্টভাষী হিসাবে সততার সাথে নিজ অতীত জীবন সম্পর্কে তোমাদিগকে এই জন্য ব্যক্ত করে দেয় যেন তোমরা ধোকায় না পড় এবং পরে চেহারা মলিন করে অন্য দিকে সরে পড়; যা বৈধ নয়। তাই কোন কোন আহমদী কিশোরদের জন্য আমার মনে অনেক সম্মান বোধ রয়েছে; তারা আমার কথা শুনলো। আমি তাদিগকে বলেছি যে, তোমরা দেখে শুনে বুঝে লও যে, এই মেয়েটি এখন পুণ্যবতী ও সৎ হল কি না; যা হয়েছে, হয়েছে। এখন তুমি তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে কোন অরুচি বোধ করবে না তো। তার দায় দায়িত্ব পালন করতে পারবে কি-না এসব বিষয় চিন্তা করে অবশ্য তাকে বিয়ে করে নাও। পরে আল্লাহ্‌র ফযলে ঐ সব বিয়ে সুসম্পন্ন হল এবং বেশ সফল হল আর তাদের মধ্যে বড়ই পবিত্র পরিবেশ সৃষ্টি হল।

কিন্তু যেস্থলে গোপন করা হয় সেস্থলে বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়। কোন কোন স্থলে তখন গোপন করা হয় যখন গোপন করার হুকুম নেই; আবার কোন কোন স্থলে তখন গোপন

করা হয় না যখন গোপন করার হুকুম রয়েছে। সততার এ মর্ম নয় যে, সব জায়গায় আপনি আপনার দোষত্রুটি বলে বেড়াতে থাকুন, ইহাও এক প্রকার পাপ। "কওলে সাদীদ" এর প্রশ্ন হয় তখন, যখন কোন ব্যবসা-বাণিজ্য অথবা বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হয়; তখন অবশ্যই আপনার উপর একান্ত দায়িত্ব বর্তায় যে, সেই দোষত্রুটি আপনি অবশ্যই প্রকাশ করে দিন যে দোষটি জ্ঞাত হওয়ার পর কোন ব্যক্তি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে যে, সে আপনার সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করবে বা করবে না। এজন্যই রসূল করীম (সাঃ) ঐ ব্যক্তিকে অভিশপ্ত করেছেন যে গমের ঢিপির উপরিভাগে শুকনো গম রাখে কিন্তু ভিতরে ভিজা গম রাখে। তাই আরবে এ দস্তুর ছিল যে, তারা ঢিপির ভিতরে গভীর পর্যন্ত হাত চুকিয়ে দানা দেখতো যে, ভিতরে ও উপরে এক রকম দানা আছে না কি। পাঞ্জাবে তো এখনো এ দস্তুর প্রচলিত আছে যে, দক্ষ দক্ষ বেপারীরা চাউল বা গমের ঢিপির কোন স্থানে ছিদ্র করে বা কোন পরিমাপ যন্ত্র নিক্ষেপ করে ভিতরে দানা বের করে দেখে নেয়। মোট কথা যে স্থলে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিষয় থাকে সেখানে নবী করীম (সাঃ)-এর এই উপদেশ রয়েছে যে, নিজে ভিতরের দানা দেখিয়ে দাও, ইহা কোন দোষণীয় বিষয় নয় বরং ইহা আপনার একান্ত কর্তব্য। কিন্তু সাধারণভাবে যদি কেহ ঐ সব বিষয় প্রকাশ করে যেগুলিকে আল্লাহ্‌তা'লা আচ্ছাদনে রেখেছেন এবং এমন লোকের নিকট প্রকাশ করে যাদের নিকট প্রকাশ করা তার কর্তব্য নয় তাহলে এটা আদৌ পুণ্যকর্ম নয়, পরন্তু পাপ বটে। ভিন্ন ভিন্ন ভারসাম্য ও ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণের এমন সুন্দর সমন্বয় রয়েছে যার ফলে ইসলামী শিক্ষার মধ্যে অতীব সুন্দর ভারসাম্য সৃষ্টি হয়।

সুতরাং হযরত রসূল করীম (সাঃ) যেস্থলে এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, বিয়ে-শাদী উপলক্ষ্যে বা ব্যবসার ক্ষেত্রে নিজের দুর্বলতা ও দোষত্রুটিগুলি বের করে সম্মুখে পেশ করে দাও। ইহা সততার অন্তর্গত। সেস্থলে আঁ-হুযূর (সাঃ) ইহাও বলেছেন, যা হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রাঃ) রেওয়ায়াত করেছেন যে, আমি স্বয়ং নবী করীম (সাঃ)-কে এই কথা বলতে শুনেছি যে, আমার সারা উম্মত ক্ষমার যোগ্য কেবল ঐ সকল মুজাহের' (গোপনীয় দোষত্রুটী প্রচারকারী) ব্যতিরেকে, যারা গোপনীয়তাকে রক্ষা করে না। কোন ব্যক্তি যদি রাত্রে কোন কাজ করে এবং ভোরে লোকদের নিকট সে উহা বলে বেড়ায় তাহলে ইহা গোপনীয়তা ফাঁস করায় অন্তর্গত হবে। অতএব যারা পাপ করে এবং তারা নিজেরাই পাপের উপর হতে আবরণ অপসারিত করে তাদেরকে রসূলল্লাহ্ (সাঃ) অভিশপ্ত করেছেন এবং জন্য অপরাধী বলে আখ্যায়িত করেছেন। অতএব উল্লিখিত দুই কথাকে মিলিয়ে ভুল ফয়সালা বের করবেন না। যখন স্বামী-স্ত্রীর বিয়ে হয়ে যায় তখন তাদের পুরনো কথাবার্তা যেগুলির উপর আল্লাহতা'লা আবরণ দিয়ে রেখেছেন—একে অপরের নিকট প্রকাশ করা সমীচীন নয়। যদি কোন এমন বিষয় থাকে যার সম্বন্ধে আশংকা হয় যে, উহা পরে প্রকাশ পেলে সম্পর্ক

উপর আল্লাহ্ তা'লা আবরণ দিয়ে রেখেছেন, একে অপরের নিকট প্রকাশ করা সমীচীন নয়। যদি কোন এমন বিষয় থাকে যার সম্বন্ধে আশংকা হয় যে, উহা পরে প্রকাশ পেলে সম্পর্ক তিক্ত হতে পারে তাহলে উহার সম্বন্ধে বিবেকও বলে এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর শিক্ষাও নির্দেশ করে যে, পূর্বেই ঐ সব বিষয় পরিষ্কারভাবে বলে দেয়া উচিত। কিন্তু কোন কোন নির্বোধ এমনও আছে যারা নিজের সুখী দাম্পত্য জীবনকে নিজেদের হাতে বিনাশ করে ফেলে। যেমন ইদানিং আমার নিকট এ ধরনেরই একটি বিষয় এসেছে যে, একজন সরল প্রকৃতির স্ত্রীর অভিযোগ এসেছে, যে স্বামীর সাথে সুন্দরভাবে কালাতিপাত করছিল। সে এমন এক সমাজের মহিলা যে সমাজে অন্যায় কাজ এমন ধরনের যে, কিছু ভুলত্রুটি সংঘটিত হওয়া দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ হয়ে গেছে, কোন ঘটনাক্রমের বিষয় নয়। জানি না ঐ অবলা নারীর মনে কেন এ খেয়াল এসে বস্‌লো যে, আমি আরো সত্যবাদী হই। একদিন সে স্বামীর নিকট নিজের পুরোনা কথা বলে ফেল্‌লো যা খোদাতা'লা গোপন রেখে ছিলেন। ঐ দিনের পর থেকে সেই স্বামী আর তার সংগে দেখাই করে না। সেই মহিলার চিঠি আসছে যে, এখন আমি কি করবো? আমাদের মধ্যে অনেক ভালবাসা ছিল। সন্তানও রয়েছে, তাদের সাথেও তার বেশ স্নেহ মমতা ছিল; কিন্তু সে আমাকে ঘৃণা করে পালিয়ে গেছে। মোট কথা, বিয়ে-শাদীর পূর্বেই বিশেষ সাবধানতার সাথে নিজের সেই সব দুর্বলতা ব্যক্ত করে দেয়া উচিত যেগুলি সম্বন্ধে ধারণা জন্মে যে, পরে এসব জানাজানি হলে অনেক ক্ষতি ও অসুবিধা হতে পারে। এরূপ করা তাক্‌ওয়ার পরিপন্থী নয় পরন্তু তাকওয়ার অন্তর্গত। কিন্তু যদি খোদাতা'লা আবরণ দিয়ে রাখেন, এমন কিছু দুর্বলতা আছে যেগুলি প্রচ্ছন্ন, অন্য লোক অবহিত নয়, সেগুলি প্রচার করা চরম নির্বুদ্ধিতা বৈ কিছু নয়, বরং আত্ম হননের অন্তর্গত। এ ধরনের রোগ কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, যেরূপে আমি এখনই উল্লেখ করলাম স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে বিনা কারণে এমন কিছু বিষয় প্রকাশ করা যা অতীতের গহ্বরে প্রচ্ছন্ন ও সমাধিস্থ হয়ে গেছে, পুণ্যকর্ম নয় বরং নির্বুদ্ধিতা; আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এসব বিষয়ই সমাজে পূতিগন্ধ হয়ে বিস্তার লাভ করে। সম্ভবতঃ এ রহস্যের প্রেক্ষাপটে নবী করীম (সাঃ) "মুজাহের" (গোপনীয় দোষত্রুটি বিস্তারকারী)-কে চরম অন্যায়কারী পাপিষ্ঠ আখ্যায়িত করেছেন; কারণ যে ব্যক্তি নিজের দোষত্রুটি ও অনিষ্ট প্রকাশে লজ্জা বোধ করেন সে-ই বাইরে বসে এমন কথা বলে বেড়ায়। বাহ্যদৃষ্টিতে সে সত্য কথাই বলে কিন্তু এমন সত্য কথা যা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে মিথ্যা হতেও নিকৃষ্টতর। এতে দু'টি পাপ বর্তায়, প্রথমতঃ সে খোদাতা'লার প্রচ্ছাদন পরদাকে নিজ হাতে টুকরো টুকরো করে; দ্বিতীয়তঃ এরূপ কথাবার্তাতে সমাজ কলুষিত হয়। ঐ সকল যুবক, যাদের মজলিসে এসব কথাবার্তা হয় যে, রাত্রে আমরা এগুলি পাপ করেছি, এসব দুষ্টুমি করেছি, উমুক স্থানে আমরা এরূপ করেছি, তারাই নির্লজ্জ এবং আল্লাহ্‌র প্রচ্ছাদন পরদাকে টুকরো টুকরো করার অপরাধতো করেই কিন্তু ঐ মজলিসে শরীক অপেক্ষাকৃত কম পাপীদের অন্তরেও পাপের জন্য

উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করে দেয়, উদ্যম জাগিয়ে দেয় যে, আমরাও এরূপ করে দেখবো না কেন।

অতএব নবী করীম (সাঃ)-কে যে ধর্ম প্রদান করা হয়েছে উহা অতীত ভারসাম্যপূর্ণ। ইহার এক একটি ছোট কথার মধ্যে বড়বড় হিকমত ও রহস্য নিহিত রয়েছে। সুতরাং নবী করীম (সাঃ)-এর একটি বিরাট অনুগ্রহ যে, যখন তিনি একদিকে "কওলে সাদীদ" (সরল সোজা সত্য ও সুদৃঢ় কথা) বলার আদেশ প্রদান করেছেন তখন তিনি অপরদিকে মুজাহেরের বিষয়টিও পরিষ্কার করে ব্যক্ত করে দিলেন যে, তোমরা কখনো "মুজাহের"(গোপনীয় দোষদ্রুটি প্রচারকারী) হয়ো না এতে তোমরা খোদার দৃষ্টিতেও পাপী এবং খোদার অকৃতজ্ঞ বান্দা গণ্য হবে এবং সমাজেও অশ্লীলতা বিস্তারকারী গণ্য হবে।

আমি এ বিষয়ে যখন চিন্তা করলাম তখন উপলব্ধি করতে পারলাম এবং হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর জন্য অন্তরে পরম ভালবাসার আবেগ ও ব্যথা সঞ্চালিত হল যে, তাঁর কুরবানী ও ত্যাগ উম্মতের জন্য চিরকাল অশেষ কল্যাণ বয়ে আনার কারণ হয়ে গেল। এ ঘটনার পর আল্লাহ্ তা'লা অনেকগুলি বিধি ব্যবস্থা কায়েম করে দিলেন। সেগুলির মধ্যে প্রত্যেক-ব্যক্তির নিজ অধিকার হয় অন্যতম। কারো কোন অধিকার নেই যে, অন্যের বিরুদ্ধে কোন অপবাদ আরোপ করুক যতক্ষণ পর্যন্ত না সে সাক্ষী পেশ করবে। যেমন কোন ব্যক্তি যদি কারো বিরুদ্ধে এই অপবাদ আরোপ করে যে, সে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে, সে এই নোংরামি করেছে, ঐ নোংরামি করেছে; যদি সে সঙ্গে সাক্ষী প্রমাণ পেশ করে তাহলে কুরআন বলে বিষয়টি তদন্ত করা যাবে। নচেৎ খোদা বলেন, সে একজন মিথ্যুক; অর্থাৎ যদিও সে সত্য কথাই বলুক না কেন তবুও খোদার বিধান অনুযায়ী সে মিথ্যুক প্রমাণিত হবে। এবং যার বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করা হয়েছে তাকে ইসলামের কোন আদালত বাধ্য করতে পারবে না.....। এই ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লা তার উপর আশ্চর্য প্রচ্ছন্নতার পরদা টেনে দিয়েছেন। গোটা উম্মতের দুর্বলদের উপর এটা একটা শক্তিশালী প্রচ্ছন্নতার পরদা টেনে দেয়া হয়েছে; বলা হয়েছে যে, তোমরা পাপ হতে আত্মরক্ষা কর কিন্তু কারো দ্বারা যদি পাপ হয়ে থাকে তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত না এ পাপ স্বয়ং পরদা ভেদ করে জনসমক্ষে চলে আসে ততক্ষণ পর্যন্ত না কারো কোন অধিকার নেই যে, খোদার প্রচ্ছাদনের পরদা ভেদ করে অন্দর মহলে ঝুঁকতে আরম্ভ করে। তবে কেবল সেই নরনারীর অধিকার আছে যারা পরস্পর স্বামী-স্ত্রী সেই ক্ষেত্রে এই আদেশ প্রযোজ্য নয় যে, তারা (চারটি) সাক্ষী তালাশ করে বেড়াবে। তাদিগকে আল্লাহ্ এই অধিকার দিয়েছেন যে, যদি নারী পুরুষকে পাপী মনে করে তাহলে সে "লিয়ান" করতে পারে, অর্থাৎ সে চারবার কসম খেয়ে এবং পঞ্চম বার মিথ্যাবাদীর উপর আল্লাহ্র অভিশাপ কামনা করে বলতে পারে যে, আমার স্বামী এই পাপ কর্মে লিপ্ত আছে; যদি স্বামী চারবার কসম খেয়ে এবং পঞ্চমবার মিথ্যাবাদীর উপর আল্লাহ্র অভিশাপ

কামনা করে অস্বীকার না করে তাহলে তার উপর অপরাধের শাস্তি ধার্য হয়ে যাবে। ঠিক একই অবস্থা মহিলারও, যদি পুরুষ তার উপর উক্ত দোষ আরোপ করে (তখন চার বার কসম খাবে এবং পঞ্চমবার মিথ্যাবাদীর উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ কামনা করবে)। মোটের উপর, স্বামী স্ত্রীর বিষয়টি এই আদেশ হতে বাদ দেয়া হয়েছে; ইহাতে পরম হিকমত নিহিত আছে। এ স্থলে নবী করীম (সাঃ) যে "মুজাহের" শব্দটি ব্যবহার করেছেন এর পরিপ্রেক্ষিতে নিশ্চিত নির্দেশ রয়েছে যে, কারো এই অধিকার নেই যে, সাধারণ সমাজে সে নিজের অপকর্মকে প্রচার করে বেড়াক। সুতরাং সাধারণ অবস্থাতে যেখানে প্রচার করার অধিকার নেই সেখানে লোক প্রচার করে বেড়ায় এবং "মুজাহের" বলে গণ্য হয়। কিন্তু যেখানে উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রশ্ন উঠে যেখানে তারা নিজেদের দুর্বলতা প্রচ্ছন্ন করে রাখে অথচ এই অবস্থায় প্রচ্ছন্ন রাখা পাপের অন্তর্গত; কারণ এইভাবে খারাপ বেচাকেনা হতে পারে। এখন দেখুন অবস্থা বিশেষে ইসলামের কত পবিত্র শিক্ষা যা অবস্থার প্রত্যেক চাহিদাকে পূর্ণ করছে। সুতরাং মিথ্যাকে অনিবার্যরূপে বর্জন করতে হবে; কিন্তু মিথ্যার সেই সংজ্ঞাকে সম্মুখে রাখতে হবে যা কুরআন করীম ব্যক্ত করেছে, যাকে কুরআন মিথ্যা বলে আখ্যা দিয়েছে। মিথ্যাকে প্রকৃত মিথ্যা বলে জ্ঞান করতে হবে যার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দিক কুরআন ব্যক্ত করেছে এবং যাকে বিভিন্ন অবস্থার ভিতর দিয়ে মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করেছে, উহাকে সম্মুখে রেখে সম্পূর্ণরূপে মিথ্যাকে বর্জন করতে হবে। এইরূপ মিথ্যা বর্জনই বস্তুতঃ কামেল তৌহীদের সঙ্গে প্রগাঢ় সম্পর্ক স্থাপনের যোগ্যতা রাখে।

এই বিষয়টি উপলব্ধি করার পর এখন আমি আপনাদের নিকট এই অনুরোধ জানাবো যে, প্রত্যেকটি আহ্‌মদী যার নিকট আমার আওয়াজ পৌঁছেছে বা লেখা পৌঁছেছে সে যেন ইহাকে নিজ দৈনন্দিন জীবনে অভ্যাসে পরিণত করে নেয়। যখনই তার উপর কোন আক্রমণ হয় অর্থাৎ তার চালচলনের উপর, তার অস্তিত্বের উপর, তার নিয়্যতের উপর তার কোন অপরাধ চিহ্নিত করা হয় তখন যে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে, কোন কথা বলার পূর্বে উহার পর্যালোচনা করে নেয়; কথা বলার পূর্বে একটু থেমে চিন্তা করে নেয়, নিজের বিষয়ে বেশ পর্যালোচনা করে নেয় যে; সে কি করছিল। অধিকাংশ সময় আপনি তাকে বাহানা তালাশ করতে হাতে নাতে ধরতে পারবেন যেরূপে রং করা হাত ধরা পড়ে। আপনার মন-বিবেক তৎক্ষণাৎ আপনার সম্মুখে চলে আসবে যে, ওহো! আমি তো এসব মিথ্যা কথা বলছিলাম। আপনি যদি এরূপ না করেন তা হলে উহা মিথ্যার রূপ নিয়ে বাইরে চলে আসবে। এবং আপনি তখন পলায়নের কোন পথ খুঁজে পাবেন না। কোন সময় একটি মিথ্যা কথা বলা হয়, তার পরে দু'টি বলা হয়, তারপর তিনটি বলা হয় তারপর চারটি বলা হয়, তারপর ক্রমাগতভাবে মিথ্যাই মিথ্যা আরম্ভ হয়ে যায়। দৃঢ় সংকল্প সহকারে এইরূপ চেষ্টা করতে হবে যে, মিথ্যার যত রকমের প্রচ্ছন্ন আশ্রয়স্থল রয়েছে সেগুলিতেও আমি মিথ্যাকে আশ্রয় গ্রহণ করতে দিব না, নিজের মনের মধ্যেও যে সব প্ররোচনার রূপ নিয়ে মিথ্যা পালিত হচ্ছে আমি সেগুলিকেও আমার দৃষ্টির সামনে উলংগ করে

ফেলবো। এর মর্ম এ নয় যে, আপনি এগুলিকে লোকের সামনে প্রচার করে বেড়ান; নিজের সামনে এগুলির পর্যালোচনা করুন। গভীর দৃষ্টিতে বিবেচনা করুন, তখন আপনি সেই যাত্রা আরম্ভ করবেন যে যাত্রা আপনাকে তৌহীদের দিকে নিয়ে যাবে, যা আসলে 'তাবাত্তুলে'র যাত্রা। এই প্রসঙ্গে কিছু আরো হাদীস রয়েছে, কিছু হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর কিতাবাদির উদ্ধৃতি রয়েছে, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা পরবর্তী জুমুয়ায় সেগুলি পেশ করবো। এই বিষয়টি এমন তাৎপর্যপূর্ণ যা মানব সমাজের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। ইহা এখন এক মূর্তি, যা ভাংলেও পুনরায় সেখান থেকে গজিয়ে উঠে; মিথ্যার এমন সব প্রতিমা রয়েছে যে, প্রত্যেকটি মানুষের অন্তরে ইহার কারখানা লেগে আছে। দৈনন্দিন জীবনে মানুষ এমন অবস্থার ভিতর দিয়ে অতিক্রম করে যে, সে যদি নিজের অন্দর মহলে একটু ঝুঁকে দেখে তখনও সে ধরা পড়ে যে, সে মিথ্যার মূর্তি নির্মাণ করছে। সাধারণ ব্যবহারিক জীবনেও মানুষ কাকেও দেখে বলতে থাকে, আরে! আমিতো আপনার দিকেই যাচ্ছিলাম আপনারই চিন্তা করছিলাম। এইরূপ অনেক ছোট ছোট কথা রয়েছে। মেহমান নেওয়াযীর দায়িত্ব পালন করছে তখনও নিজের প্রভাব বিস্তার করার জন্য জিহ্বায় বলতে থাকে, অথচ অন্তরে বলে এটা একটা বিপদ হয়ে গেছে, আপনি সানন্দে পান করুন, এসব আপনারই। এসব দৈনন্দিনের মিথ্যা। আমি আপনাদিগকে একথা বুঝাচ্ছিলাম যে, সাধারণ ঘরে, সাধারণ মন-মস্তিষ্কে, সাধারণ দৈনন্দিন অবস্থায় মিথ্যা এভাবে পালিত হতে থাকে এবং মিথ্যার মূর্তি নির্মাণ হতে থাকে যা বাহ্য দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। লোকের মুখে কথা আছে যে, এক নিমন্ত্রণ উপলক্ষ্যে কোন ভদ্রলোকের ঘরে চমৎকার গোলাপজাম তৈরী করা হল। কোন মহিলা বলতে লাগলো, বড়ই চমৎকার গোলাপজাম হয়েছে, আমি ছয়টি খেয়ে ফেলেছি, খুব স্বাদ লাগলো। নিমন্ত্রণকারী বললো, আপনি যত ইচ্ছা আরো খান। আপনি খেয়েছেন আসলে বারটি কিন্তু এত গণে কে? তারা উভয়েই মিথ্যা বলছিল, 'যত ইচ্ছা আরো খান, বলাই তো মিথ্যা ছিল; কারণ যে ব্যক্তি গণছিল যে, "আমার মেহমান বারটি গোলাপজাম খেয়ে ফেলেছে তার মন তো প্রত্যেকটি গোলাপজামেই বিষণ্ণ হচ্ছিল। আর যে বেশী খেয়েছিল সে প্রশংসা করে নিজের উপর পরদা টানার জন্য মিথ্যা বললো। কথাটি অবশ্য কৌতুক বটে কিন্তু উভয় পক্ষই মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিল। আসলে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এসব কথাকে সাধারণ মনে করা হয়, এরূপ শত কত দৃষ্টান্ত রয়েছে। যদি কোন ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনের এ ধরনের ঘটনার গণনা করা হয় তা হলে ঘন্টার পর ঘন্টা দরকার হবে। মানুষ প্রথম প্রথম এরূপই মিথ্যা রচনা করতে আরম্ভ করে। এখন ইহা কিছুই মনে করা হয় না। কিন্তু একবার আরম্ভ হলে পরে উহা পালিত হতে থাকে; পালিত হতে হতে বাইরে বের হতে থাকে; বিভীষিকাময় রূপ নিয়ে বের হয়। আল্লাহ্তা'লা আমাদের সমাজকে আপাদমস্তক মিথ্যা হতে মুক্ত করুন, কারণ মিথ্যা বর্জন না করে আমরা আদৌ মুওয়াহ্হেদ (তৌহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত) ও হতে পারবো না এবং জগতকেও তৌহীদের শিক্ষা দিতে পারবো না; আর আমি পূর্বেও বলেছি যে বর্তমানে জগতের মুক্তি কেবল তৌহীদের সঙ্গে সম্পৃক্ত। অতএব হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-কে আল্লাহ্ তা'লা যেগুলি শব্দে সম্বোধন করেছেন, আমি সেগুলি শব্দে তাঁর রূহানী প্রজন্মকে সম্বোধন করে বলছি, অর্থাৎ হে মসীহ্ মাওউদের রূহানী সন্তানগণ! তৌহীদকে সুদৃঢ়ভাবে অবলম্বন কর, তৌহীদকে সুদৃঢ়ভাবে অবলম্বন কর, ইহারই সাথে জগতের মুক্তি সম্পৃক্ত রয়েছে।

ঈদুল ফিতরের খুতবা

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী আল্ মুসলেহুল মাউওদ (রাঃ)

[১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৩৬ ইং তারিখে প্রদত্ত]

অনুবাদক : মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরব্বী,

প্রকৃত ঈদ এই যে, মানুষ যেমন কর্মে আস্বাদ ও আনন্দ অনুভব করে এবং সে খোদাতা'লার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক প্রকারের কুরবানীর জন্য প্রস্তুত থাকে। চেষ্টা কর যেন তোমাদের এই প্রকৃত ঈদের সৌভাগ্য লাভ হয়।

যখন এই ঈদ মানুষের লাভ হয় তখন আর দুনিয়ার কোন দুঃখ-কষ্ট তাহাকে উদ্বিগ্ন করিতে পারে না।

তাআওউয্ ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযুর আকদস (রাঃ) বলেন :

দুনিয়াতে দুই প্রকারের ঈদ আসে। একটি স্থায়ী ঈদ, আর একটি অস্থায়ী বা সাময়িক ঈদ হইয়া থাকে। অস্থায়ী ঈদের দৃষ্টান্ত হইল ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহা। এ সকল ঈদ আসে এবং চলিয়া যায়। দীর্ঘদিন পর পুনরায় এক ঈদ আসে এবং কিছুদিন পর আর একটি ঈদ আসিয়া যায়। উক্ত দুই ঈদের মধ্যে প্রায় সোয়া দুই মাসের ব্যবধান হইয়া থাকে। এমনি ধারায় প্রত্যেক বৎসর একটির পর আর একটি ঈদ আসে। রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম জুমুআকেও ঈদ বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। এই হিসাবে এক প্রকারের ঈদ প্রত্যেক সপ্তাহে সপ্তম দিনেও আসে। কিন্তু যাহা হউক ছয় দিন অতিবাহিত হওয়ার পর তাহা আসে। সপ্তাহের মধ্যে অন্যান্য দিন জুমুআ সংক্রান্ত ঈদ হয় না বরং ঈদ শুক্রবারই হয় এবং শুক্রবার অতিক্রান্ত হইলে আবার সাধারণ দিন শুরু হইয়া যায়। মোট কথা, এই তিন প্রকারের ঈদ অস্থায়ী বা সাময়িক ঈদ, স্থায়ী ঈদ নয়। এতদ্বিষয়ে আল্লাহ্তা'লা মুমেনকে এই শিক্ষা দিয়াছেন যে, সে যেন তাহার কোন রূহানী মাকামে পরিতুষ্ট হইয়া না পড়ে। যদি কোন ব্যক্তি জুমুআর দিন আসিলে খুশীতে স্ফীত হয়, যেমন—কোন ছাত্র শুক্রবার আসিলে উহা তাহার ছুটির দিন হওয়াতে স্ফীত হয় এবং স্কুলে যাওয়া ছাড়িয়া দেয়। তাহা পরের দিন করিলে তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইবে। এক দিকে তাহার বাপ-মা তাহার প্রতি রুষ্ট হইয়া তাহাকে ঘর হইতে স্কুলে পাঠাইবে। আর অন্যদিকে শিক্ষক তাহাকে শাস্তি দিবেন। তেমনিভাবে ঈদের দিন আসিলে যদি মানুষ মনে করে যে, বাস্, ঈদ তো আসিয়াই গিয়াছে, সুতরাং রোযাও শেষ হইয়াছে। ইহার পর যখন পুনরায় রমযান মাস আসে তখন যদি সে বলে যে, আমি আর রোযা রাখিতে পারি না কেননা ঈদ যে আসিয়াছিল। তাহা হইলে এইরূপ ব্যক্তি তাহার ঈমান হারাইবে এবং খোদাতা'লার দৃষ্টি হইতে স্খলিত হইয়া পড়িবে। মোটকথা, এই সকল ঈদ মানুষের দৃষ্টি এই বিষয়ের দিকেই আকৃষ্ট করে যে, রূহানী মাকামও অস্থায়ী মাকাম হইয়া থাকে।

আল্লাহ্‌তা'লা রহম করুন। একজন আহমদী ছিলেন, এখন তিনি আর ইহজগতে নাই। জনৈক বন্ধু শুনাইয়া ছিলেন যে, তিনি তাহার নিকট একবার গিয়া বলিয়ছিলেন যে, 'সেলসেলার বিভিন্ন প্রয়োজনের তাগিদে চাঁদা দিন।' তিনি বেশ বিত্তশালী ব্যক্তি ছিলেন কিন্তু চাঁদার কথা শুনিয়া বলিতে লাগিলেন যে, 'আমি হযরত সাহেবের (আঃ) যামানায় বড় বড় চাঁদা দিয়াছি, এবং এখন আমি মনে করি, আমার উপরে আর কোন চাঁদা বর্তায় না।' অতঃপর ইহার ফল কি দাঁড়াইল? শেষ পরিণাম তাঁহার এই ঘটিয়াছিল যে, বন্ধুগণ একদিন দেখিতে পাইলেন যে, তিনি নামায পড়েন না। তাঁহাকে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতে লাগিলেন যে, "আমি অনেক নামায পড়িয়াছি। সরকার ও দীর্ঘকাল কাজ লইবার পর পেনশন দেয়। খোদা কেন দিবেন না?' অতএব দেখুন একটি বিষয় (ভুল) তাহাকে আর একটি বিষয়ের (ভুলের) দিকে লইয়া গেল। মিথ্যা আস্থা ও আত্মপ্রতারণার স্বীকার হন এবং মনে করেন যে, তাহার ঈদ আসিয়া গিয়াছে, যাহার ফল এই দাঁড়াইল যে, প্রথমে চাঁদা গেল, তারপর নামায ছুটিল। অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'লা তো তাহার প্রতি দয়া করিলেন যে, তাহাকে মৃত্যু দিলেন, অন্যথায় ইহাও সম্ভব ছিল যে, তিনি বলিতেন যে, 'খোদার উপর আমি দীর্ঘকাল ঈমান রাখিয়াছি, এখন উহা হইতেও পেনশন পাওয়া উচিত।' যদিও তাহার জীবনের কর্মের অংশ লোপ পাইল কিন্তু মৃত্যুর কারণে তাহার ঈমানী অংশ রক্ষিত হইল। ইহা তো একটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও খোলাখুলি দৃষ্টান্ত। কিন্তু এই প্রকারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত প্রায় প্রত্যেক শহরে এবং প্রত্যেক মহল্লায় পাওয়া যায়। কিছু দিন পর্যন্ত কতক মানুষের মধ্যে দীনের খেদমতের জোশ থাকে এবং তাহারা প্রত্যেক প্রকারের কুরবানীতে অংশ নেন; কিন্তু কিছু দিন পর তাহারা কুরবানী ছাড়িয়া দেন এবং মনে করেন, 'আমরা তো অনেক কিছুই করিয়াছি।' ইহা অস্থিতিশীলতার রুগ্ন স্বভাব, যাহা অনেক মানুষের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। এবং এই অস্থিতিশীলতা মিথ্যা আস্থা ও আত্মপ্রতারণারই নামান্তর। মানুষ মনে করে, সে অনেক কিছু করিয়া ফেলিয়াছে। সে ইহা বুঝে না যে, আমাদের শরীয়তের মধ্যে 'অনেক কিছু'—এর কোন অর্থ নাই। দেখ, আল্লাহ্‌তা'লা কখনও বলেন না যে, আমি আমার বান্দাকে অনেক কিছু দিয়া ফেলিয়াছি। কিন্তু বান্দা কিছু দিন খেদমত করার পর মনে করিতে আরম্ভ করে যে, সে অনেক খেদমত করিয়াছে। ইহা কি আশ্চর্যের কথা নয় যে, বান্দাগণ খোদাতা'লার দান সম্বন্ধে ইহা বলিতে আরম্ভ করে যে, তিনি অনেক কিছু দিয়াছেন, কিন্তু খোদতা'লা ইহা বলেন না যে, তিনি তাঁহার বান্দাকে অনেক বেশী দিয়াছেন। সুতরাং দেখুন, আর্যসমাজীগণের বিশ্বাস যে, কিছু-কাল পর্যন্ত মানবাত্মাকে রাখার পর খোদাতা'লা সেগুলিকে জান্নাত হইতে বহিষ্কৃত করিবেন এবং সেগুলোকে পুনরায় দুনিয়াতে পাঠাইয়া দিবেন। প্রসিদ্ধ প্রবাদ বাক্য আছে:

داتا دے اور بھنڈاری کا پیٹ پھٹے

('দাতা তো দানে উদ্যত কিন্তু কোষাধ্যক্ষের তাহাতে প্রাণ ফাটে)। খোদাতা'লা তো বলেন, আমি আমার বান্দাদিগকে চিরস্থায়ী জান্নাত দান করিব কিন্তু আর্য সমাজীগণ বলেন যে, চিরস্থায়ী জান্নাত কিরূপে দিতে পারেন? যদি তিনি তাহা দিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে তাঁহার খাযানা বা ভাণ্ডার 'নাউযুবিল্লাহ' খালি হইয়া যাইবে। এই আপত্তি প্রকৃতপক্ষে তাহাদের নিজেদেরই (নীচু) স্বভাবের দর্পণস্বরূপ এবং উহারই পরিচায়ক হইয়া থাকে। তাহাদের স্বভাবে যেহেতু কৃপণতা রহিয়াছে এবং তাহারা ইহা বলিতে অভ্যস্ত হইয়া থাকে যে, তাহারা অনেক বেশী দিয়া ফেলিয়াছে, অনেক খেদমত পালন করিয়াছে, সেই জন্য তাহারা খোদাতা'লার দিকেও সে কথাই আরোপ করে। অথচ, জান্নাতের নে'মতসমূহ সম্পর্কে খোদাতা'লা বলেন: عطاء غير مجذوذ অর্থাৎ, আমরা জান্নাতীগণকে যাহা কিছু দান করিব তাহা ফেরৎ লইব না বরং আমাদের পুরস্কার দান নিরন্তর অব্যাহত থাকিবে। প্রকৃতপক্ষে সাধারণ মোমেনের জন্য তাহাই প্রকৃত ঈদ। অন্য কথায়, যে স্থায়ী ঈদ সাধারণ মোমেনের জন্য হইয়া থাকে তাহা হইল জান্নাত। এবং জান্নাতই মোমেনের আসল মাকাম।

যে বান্দা এই দুনিয়াতে তাহার রূহানী কর্তব্যসমূহ পরিত্যাগ করিয়া বসিয়া পড়ে, সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

আমার একটি ঘটনা সদা স্মরণ পড়ে। আমি একবার জুমুআর নামায হইতে অবসর হওয়ার পর মসজিদ হইতে ফিরিতে ছিলাম তখন জনৈক বন্ধু বলিলেন যে, কোন এক ভদ্রলোক আসিয়াছেন যিনি কিছু প্রশ্ন করিতে চান। তিনি একজন অ-আহমদী ছিলেন। হুশিয়ারপুর এলাকার অধিবাসী ছিলেন। তিনি আগাইয়া আসিলেন এবং বলিলেন যে, আমি একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে চাই। আমি বলিলাম, বলুন। তিনি বলিতে লাগিলেন, "যদি কেহ নদীর অপর পাড়ে যাওয়ার জন্য নৌকায় আরোহণ করে, সে পাড়ে ভিড়িয়া কি করিবে? উক্ত প্রশ্নের দুইটি উত্তর দেওয়া যাইতে পারিত: সে হয়ত নামিয়া পড়িবে, নয়ত বসিয়া থাকিবে। সাধারণ অবস্থায় মানুষ এই জবাবই দিতে পারে যে, যখন মানুষ নদীর কিনারায় ভিড়ে তখন বুদ্ধিমান মানুষের কাজ এই যে, নৌকা হইতে নামিয়া পড়িবে। সুতরাং সেই ব্যক্তি যেন তাহার ধারণা মত এক বাঁধা আমার সামনে রাখিয়াছিল, এবং মনে করিয়াছিল যে, আমি এই উত্তরই দিব যে, কিনারা আসিয়া গেলে মানুষের নৌকা হইতে নামিয়া পড়া উচিত। আর আমার সেই উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে সে এই দ্বিতীয় প্রশ্নটি করিত যে, ভাল কথা, যখন মানুষ খোদাকে পাইয়া যায় তখন তাহার আর ইবাদতের কি প্রয়োজন? কিন্তু যেমান সে ঐ প্রশ্ন করিল তেমনি আল্লাহ্‌তা'লা সেই প্রশ্নের প্রকৃত স্বরূপ ও উদ্দেশ্য আমার নিকট প্রকাশ করিয়া দিলেন এবং আমি তাকে এই জবাব দিলাম, যে নদীর মধ্যে সে নৌকায় চড়িয়াছে যদি উহার কোন কিনারা থাকে, তাহা হইলে কিনারা আসিলে সে যেন অবশ্যই নামিয়া যায়, কিন্তু যদি সেই নদীর কোন কিনারাই না থাকে তাহা হইলে সে যেখানেই

নামিবে সেখানেই সে ডুবিয়া যাইবে। আমার এই জবাবে সে হতবাক হইয়া পড়িল এবং কিছুক্ষণ চুপ থাকিবার পর বলিতে লাগিল, 'তাহা হইলে তো ইবাদতগুলি সর্বদাই করিতে হইবে।" সে প্রকৃতপক্ষে সাধারণ পীর-ফকীরদের নিকট হইতে এই প্রকারের কথা শুনিয়া আসিয়াছিল এবং তাহার উদ্দেশ্য ছিল, নামায পড়া হয় খোদাতা'লার সাক্ষাৎ লাভের জন্য, কিন্তু যে ব্যক্তি খোদাকে পাইয়া গেল, তাহার আর নামাযের কি প্রয়োজন? রোযা রাখা হয় খোদাতা'লার মিলনের জন্য। যাহার তাহা লাভ হইয়া গেল, তাহার আর রোযার কি দরকার? তেমনিভাবে যাকাত দেওয়া হয় আল্লাহ্‌তা'লাকে পাওয়ার জন্য, কিন্তু যে আল্লাহ্‌কে পাইয়া গেল, তাহার আর যাকাতের কি আবশ্যক? মোট কথা যত প্রকারে নেকী (পুণ্যকার্য) আছে সবই খোদাতা'লার মিলন লাভে নিঃশেষ হইয়া গেল। কেন-না নেকী সওয়ারী বা বাহন স্বরূপ হইয়া থাকে, এবং যখন মানুষ গৃহে পৌঁছিয়া গেল, তখন সওয়ারীর উপরে বসিয়া থাকা বোকামিই বটে। আমি তাহার আপত্তি বা প্রশ্নটি অনুধাবন পূর্বক তাহাকে এই জবাব দিলাম যে, যখন গন্তব্যস্থল সীমিত প্রকৃতির হয় তখন মানুষ যানবাহন হইতে নামিয়া পড়িবে কিন্তু যখন গন্তব্যস্থল অসীম ও অনন্ত হয় তখন নামিয়া পড়ার কি অর্থ হইতে পারে? সে যেখানেই নামিবে সেখানেই ধ্বংস হইবে। মোটকথা, আমার অন্তরে আল্লাহ্‌তা'লা এই প্রকৃত সত্য উদ্ভাসিত করিলেন এবং আমি তাহাকে ইহাই বলিলাম যে, অসীম নদীতে নৌকা হইতে অবতরণকারী নিমজ্জিত হইবে, উদ্ধার পাইবে না। তেমনিভাবে, এরূপ অনেক লোক দুনিয়াতে পাওয়া যায় যাহারা যদিও ঐরূপ পীর-ফকীরদের মুরিদ বা শিষ্য হয় না কিন্তু এই প্রকারের ধ্যান-ধারণার বশবর্তী হইয়া থাকে। তাহারা গোপন থাকে, তাহাদের অন্তরের ধারণা জানা থাকে না কিন্তু এমন এক দিন আসে যখন তাহারা উলঙ্গ হইয়া পড়ে। তাহারা যদিও বাহ্যতঃ ঐ সকল পীর-ফকীরে বিশ্বাসী ও তাহাদের অনুসারী হয় না, কিন্তু কার্যতঃ তাহাদের মতাদর্শী ও অনুসারী হইয়া থাকে। তাহারা কিছুদিন নামায পড়ে, আর মনে করিয়া লয় যে, অনেক নামায তাহারা পড়িয়াছে, এখন তাহাদের আর নামাযের প্রয়োজন নাই। তাহারা কিছুদিন রোযা রাখে, তারপর মনে করে, তাহাদের আর রোযা রাখার প্রয়োজন নাই। তাহারা কিছুদিন দান-খয়রাত করে, তারপর মনে করে, তাহাদের আর দান-খয়রাত করার প্রয়োজন নাই, কেন-না অনেক দান-খয়রাত তাহারা করিয়াছে। অথচ তাহারা তাহাদের খাওয়া-পরার ব্যাপারে কখনও এই ধারণা করে না যে, তাহারা অনেক খাওয়া-দাওয়া করিয়াছে, অনেক কাপড়-চোপড় পরিয়াছে, অনেক দিন তাহারা রুটি বা ভাত খাওয়ার বা পানি পান করা পর ইহা বলে না যে, অনেক রুটি বা ভাত খাইয়াছে এবং পানি পান করিয়াছে; এখন আর না খাওয়ার প্রয়োজন আছে, না পান করার প্রয়োজন আছে, আর না কাপড় পরার প্রয়োজন আছে। বরং তাহারা নিজেদের দৈহিক শক্তি বজায় রাখার জন্য, দেহকে শীত ও তাপের ক্রিয়া হইতে রক্ষা করার জন্য

সদাসর্বদাই প্রচেষ্টা চালাইয়া যায়। কিন্তু রূহ বা আত্মার যেখানে প্রশ্ন আসে সেখানে বলিতে আরম্ভ করে যে, আমরা অনেক এবাদত করিয়াছি, এখন আর নামায-রোযার প্রয়োজন নাই। অন্য কথায়, দৈহিক খাদ্যের ব্যাপারে তো মানুষ সর্বদা খেয়াল করে যে, তাহার অমুক অমুক আহারাদি সদা পাইতে থাকা আবশ্যকীয়। কিন্তু রূহানী খাদ্য সম্পর্কেই তাহার সর্বদা এই ভাবপ্রবণতা থাকে যে, উহা যেন সে পরিত্যাগ করিতে পারে। অথচ তাহার নিত্যনৈমত্তিক খাদ্যের যেমন সর্বদা প্রয়োজন আছে তেমনি তাহার রূহানী খাদ্যেরও সদা-সর্বক্ষণ প্রয়োজন রহিয়াছে। কিন্তু তাহার অবস্থা এই দাঁড়ায় যে, কিছুকাল সে নামায পড়ে, রোযা এবং শরীয়তের অন্যান্য আদেশ পালন করে কিন্তু যখনই কয়েকটি স্বপ্ন দেখে অথবা কোন কোন আসমানী বরকত ও কল্যাণের কিছু অংশ তাহার হাসিল হয়, তখনই সে মনে করিতে আরম্ভ করে যে, এখন আর তাহার ঐ সকল ইবাদতের প্রয়োজন নাই, সে যেন এখন জন্মগতভাবেই স্বাধীন হইয়া পড়িয়াছে—না তাহার নামাযের প্রয়োজন, না রোযা রাখার, না হজ্জ করার, না সেলসেলার নেযামের পাবন্দি করার প্রয়োজন, না এতায়াত ও আনুগত্যের প্রয়োজন; এখন খোদার সহিত তাহার সরাসরি সংযোগ স্থাপন হইয়াছে। এইরূপ আহম্মকের দৃষ্টান্ত ঠিক এমনই, যেমন গভর্নর যখন বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যায় তখন কোন কোন সময় বাদশাহ সেই গভর্নরের চাপরাশি বা আর্দালীর সহিতও হাসিয়া দুই এক কথা বলিয়া ফেলে। ইহাতে যদি সেই আর্দালী চাকুরী ছাড়িয়া দেয় এবং মনে করিতে আরম্ভ করে যে, এখন সে এতই বড় হইয়া গিয়াছে যে, বাদশাহ তাহার সহিত সরাসরি কথা বলিতে পারেন। তা হইলে সে নিছক নির্বোধ। সে বুঝে না যে, যখন গভর্নর চলিয়া যাইবে এবং সে সেখানে থাকিবে, তখন তাহাকে কান ধরিয়া বাহির করিয়া দেওয়া হইবে। এবং যেদিন সে গভর্নরের অধীন চাকুরী হইতে পৃথক হইবে, সেই দিন হইতে কেহই তাহাকে নিজের দুয়ারেও ভিড়িতে দিবে না।

প্রকৃতপক্ষে, কোন সময়ে আর্দালির সহিত বাদশাহর কথা বলার অর্থ আর্দালির সহিত কথা বলা নয়, বরং গভর্নরের সহিত কথা বলা হইয়া থাকে, এবং তাহার এরূপই দৃষ্টান্ত হইয়া থাকে, যেমন আমাদের নিকট কোন বন্ধু দেখা করিতে আসে এবং তাহার সহিত কোন ছোট শিশু থাকে, তখন সেই শিশুটিকেও আমরা একটু আদর করিয়া দেই। এমতাবস্থায় সেই শিশুর প্রতি স্নেহ প্রদর্শনের অর্থ প্রকৃতপক্ষে সেই বন্ধুর প্রতিই আমাদের ভালবাসা প্রকাশ করা হইয়া থাকে। অন্যথায় সেই শিশুটির প্রতি আমাদের কি-বা ভালবাসা থাকিতে পারে? সে তো যখন বড় হইবে, তখন জানা যাইবে, আমাদের প্রতি বন্ধুত্ব রাখিবে না শত্রুতা! এখন যে আমরা তাহাকে স্নেহ করি তাহা তো প্রকৃতপক্ষে বন্ধুর কারণে। যেহেতু আমাদের বন্ধুর কার্যাবলী প্রকাশমান এবং আমরা জানি যে, সে আমাদের প্রতি ভালবাসা রাখে, সেজন্য তাহার সন্তানের প্রতিও স্নেহ প্রদর্শন করি।

সুতরাং অনেকে এই বোকামীর কারণে যে, তাহাদের উপরও আল্লাহ্‌তা'লার তরফ হইতে কোন কোন ফয়েয বা কল্যাণ লাভ হইয়াছে বলিয়া তাহারা মনে করিতে আরম্ভ করে যে, এখন তাহারা সে মাকামে পৌঁছিয়া গিয়াছে যেখানে তাহাদের আর কোন সাধনা বা খেদমত পালন করার প্রয়োজন নাই। ইহার ফল দাঁড়ায় যে, তাহারা মারা পড়ে এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তাহারা একটি অস্থায়ী ঈদকে স্থায়ী ঈদ বলিয়া ধরিয়া নেয় এবং এমনি ধারায় রূহানীরূপে তাহারা নিপাত হইয়া হইয়া। অথচ চিরস্থায়ী ঈদ মৃত্যু বরণের পরপারের ঈদই হইয়া থাকে। অথবা সেই ব্যক্তির জন্য স্থায়ী ঈদ হয়, যে তাঁহার জীবদ্দশাতেই মৃত্যুকে বরণ করিয়াছে; কিন্তু আমল ঐরূপ ব্যক্তির ক্ষেত্রেও মাফ বা রহিত হয় না।

দ্বিতীয় প্রকার বোকামী এই হইয়া থাকে যে, আমলকে শাস্তি স্বরূপ মনে করে অথচ আমল যদি শাস্তি হয় তাহা হইলে খাদ্যও শাস্তি। কেননা রুটি বা ভাত খাওয়াও একটি আমল বা কর্ম। পানি পান করাও এবং কাপড় পড়াও এক একটি আমল কিন্তু দৈহিক ক্ষেত্রে তো মানুষের স্বভাব এই যে, তাহারা যত বেশী শক্তি লাভ করে, তত বেশী খাওয়া-পরার আমল বা কর্মকে বাড়াইয়া দেয়, কম করে না। সুতরাং দেখুন, কোন শক্তিশালী ব্যক্তি তাহার আহার কমায় না বরং পূর্বের তুলনায় বাড়াইয়া দেয়। অথবা যখন মানুষ বিত্তশালী হইয়া উঠে, তখন সে তাহার পোষাকের সংখ্যা কমায় না বরং বাড়ায় কিন্তু রূহানীয়্যতের ক্ষেত্রে মানুষ চায় যেন তাহাদের খাদ্য কমাইয়া দিতে পারে। অথচ রূহানীয়্যতের অধিকারী ব্যক্তিবর্গেরও যেমন উত্তরোত্তর রূহানী শক্তি হাসিল হইতে থাকে তেমনিই তাহাদের রূহানী খাদ্য বৃদ্ধি করিতে থাকে, কমানোর কথা দূরে থাকুক।

একজন পাহ্‌লোয়ানের খাদ্য এবং একটি শিশুর খাদ্যের মধ্যে তফাৎ কি? ইহাই যে, শিশু কম খায় এবং পাহ্‌লোয়ান বেশী খায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, মানুষ মনে করে তাহারা রূহানী পাহ্‌লোয়ান হওয়ার দাবী তো করিয়া বসুক কিন্তু তাহাদের খাদ্য শিশুদের তুল্য থাকুক। তোমরা কি কখনও দেখিয়াছ যে, কোন পাহ্‌লোয়ান ব্যক্তি চুষি-কাঠি দ্বারা দুধ পান করিতে শুরু করিয়াছে? এবং সে ইহা বলে যে, এখন যেহেতু আমি পাহ্‌লোয়ান হইয়া গিয়াছি, সেজন্য চুষি-কাঠির দ্বারা পান করি? এরূপ যখন কখনও হইয়া থাকে না, বরং পার্থিব দেহ সম্পর্কে ইহা বলা হয় যে, পাহ্‌লোয়ান এবং শিশুর মধ্যে তুলনাই বা কি হইতে পারে?! সুতরাং রূহানী ব্যাপারে কম্‌তির দিকে আসাও কোন বোধ রূহানী ব্যক্তির কাজ হইতে পারে না। আপনারা কখন হয়ত এরূপ ঘটিতে দেখেন নাই, কোন শক্তিশালী বিরাট পাহ্‌লোয়ান ইহা বলে যে, দুধের এক ছোট্ট পেয়ালা তার তৃপ্তি মিটাইবার জন্য যথেষ্ট; এক সের পরিমাণ দুধ এবং অন্যান্য পুষ্টিকর শক্তিশালী খাদ্যের তাহার প্রয়োজন নাই। কিন্তু রূহানীয়্যতের ব্যাপারে যখনই মানুষের উপর সামান্য কিছু এলাহী ফয়েয নাযেল হয়, তখন সে দুর্বলতা দেখাইতে আরম্ভ করে এবং বলে, এখন তাহার এই সকল মুজাহেদা ও সাধনার প্রয়োজন কি?! এইরূপ ধারণা পাগলামীর লক্ষণ তো হইতে পারে কিন্তু জ্ঞান-বুদ্ধির আলামত বলিয়া আখ্যাত হইতে পারে না।

মোট কথা আমল কোন অবস্থাতেই পরিত্যাগ করা যায় না—ইহকালেও না, পরকালেও না। পার্থক্য শুধু এইটুকু যে, পরকালে মুমেনের জন্য যে চিরস্থায়ী ঈদ হইবে উহার এই অর্থ হইবে যে, তখন সেই পুরস্কার আর বিনষ্ট হইবে না। অন্যথায় কাজ সেখানেও পরিত্যক্ত হইবে না। পরিশেষ আল্লাহ্‌তা'লা ঈদের দিনে কোন নামায মাফ তো করিয়া দেন নাই, বরং একটি নামায তিনি আরও বাড়াইয়া দিয়াছেন, যাহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, ইসলামী ও রূহানী ঈদ কাজ ছাড়িয়া দিবার নাম নয় বরং কাজ বাড়াইয়া দেওয়ার নামই ঈদ।

মোট কথা, আমল কোন অবস্থাতে ছাড়া যায় না—এই জাহানেও নয় এবং ঐ জাহানেও নয়। অবশ্য পুরস্কার স্থায়ী হইতে পারে। এবং উহা কখনও এই দুনিয়াতেও মানুষ স্থায়ীরূপে লাভ করে। যাহারা এই দুনিয়াতে জীবিত থাকা অবস্থাতেই মরিয়া যায়, তাহাদের পুরস্কারের আল্লাহ্‌তা'লার তরফ হইতে স্থায়ী (রূপদান) করা হয়—অন্য কথায়, এরূপ লোকের উপর ইহকালেই 'ইওমুল—বা'স' (পুনরুত্থান দিবস)-এর আগমন ঘটে, যে সম্বন্ধে কুরআন করীমে আসিয়াছে যে, শয়তান আল্লাহ্‌তা'লার নিকট আবেদন করিয়াছিল, তাহাকে যেন কিছু অবকাশ দান করা হয় যাহাতে সে মানুষকে 'ইওমিলবা'স' পর্যন্ত প্ররোচিত ও পথভ্রষ্ট করিতে পারে। ইহার দ্বারা জানা যায় যে, যে ব্যক্তির উপর 'ইওমিলবা'স' আসিয়া যায় তাহার ঈদ এই দুনিয়া হইতেই স্থায়ী হইয়া যায় এবং সে তাহার মাকাম ও দর্জা হইতে স্খলিত বা পতিত হয় না। রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপর সেই ঈদ এ দুনিয়াতেই আসিয়াছিল এবং তিনি এরূপ মাকামে পৌঁছিয়া ছিলেন যে তাঁহার জন্য অসম্ভব ছিল যে তিনি পতিত হইতে পারিতেন। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, তিনি কি আমল করা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন? তিনি কি নামাযসমূহ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন? তেমনিভাবে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর উপরও সেই দিবস আসিয়াছিল কিন্তু তিনি কি দীনের প্রচার ও প্রসারের কাজ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন? খেদমতে-খালেক (সৃষ্টির সেবা) কি ছাড়িয়াছিলেন? আমরা তো ইহাই দেখি যে, তিনি রাত দিন সমানে কাজ করিতেন। সুতরাং কাজ ছাড়িয়া বসার নাম ঈদ নয়, বরং কাজকে বাড়াইয়া দেওয়া এবং উহাতে আনন্দ অনুভব করাই ঈদ।

সুতরাং দেখুন, যেদিন আমরা ঈদ পালন করি সেদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায ব্যতীত এক ষষ্ঠ বার নামাযও আমাদের পড়িতে হয়। কিন্তু যেহেতু আমরা জানি যে, ইহার দ্বারা রূহানীয়াতের উন্নতি হয়, আল্লাহ্‌তা'লার সন্তোষ লাভ হয় এবং তাঁহার মহব্বত হাসিল হয়—ইহা শুধু আমাদের আকীদা বা বিশ্বাসের কথাই নয় বরং আমাদের জামাতের মধ্যে প্রতিটি অংশ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এই সকল নে'মত প্রত্যক্ষ করিয়াছে, সেই জন্য এই অতিরিক্ত এবাদত বোঝা হওয়ার পরিবর্তে আমাদের জন্য আনন্দের কারণ হইয়া থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি এই সত্য সম্বন্ধে অজ্ঞ এবং ঈদের অর্থ শুধু এটুকুই মনে করে যে, ভাল কাপড় পড়িয়াছে এবং ভাল ভাল খাইয়াছে; সে ইহাই বলিলে যে, ভাল বিপদই আসিল—পূর্বে তো পাঁচ ওক্তেরই নামায ছিল, আজ যে ঈদের দিন, তাহাতে ছয় উক্ত নামায আরোপ করা হইয়াছে, আবার এই নামাযের

সঙ্গে খোতবাও রাখা হইয়াছে, অন্য কথায় ষষ্ঠ নামাযের পরেও যেটুকু সময় মানুষ তাহার ঘরে কাটাইতে পারিত, সেইটুকু সময়ও আর থাকিতে দেওয়া হয় নাই, উহারও একাংশ খোতবার জন্য রাখা হইয়াছে। কিন্তু ইহা নির্বুদ্ধিতার কথা এবং এ সকল ধারণার তখনই উদয় হয় যখন কর্মের মাহাত্ম্য ও মূলতত্ত্ব মানবের নিকট সুপ্রকাশিত হয় না। অন্যথায় যে সকল লোকের উপর يوم يبعثون (ইওমা ইউবয়াসুন) সংক্রান্ত অবস্থা বিরাজিত হয়, তাহারা কর্মকে বোঝা মনে করে না, বরং তাহাতে আরও আনন্দিত হয়। যেমন পিতা যখন তাহার সন্তানগনের জন্য কোন কাজ করে তখন উহাকে বোঝা মনে না করিয়া বরং অনুভব করে, অথবা একজন খোদাভীরু ডাক্তার যে খেদমতে খালকে মশগুল থাকে এবং রাত হউক বা দিন হউক রুগীদিগকে দেখার জন্য চলিয়া যায়, সে খেদমত বা সেবাকে বোঝা মনে করে না বরং আনন্দ অনুভব করে অথবা জ্ঞান শিক্ষাদানকারী সাধক ব্যক্তি যে চায় যেন সব সময় ছাত্রদিগকে জ্ঞান শিক্ষা দিতে পারে এবং রাত দিন এই কাজে আত্মনিবেদিত থাকে সে এই কাজকে বোঝা মনে করে না বরং সে খুশী হয় যে খেদমত করার তওফিক পাইতেছে। সুতরাং যখন মানবের অন্তরে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ ও আত্ম প্রসাদের সৃষ্টি হয় তখনই আমল বা কর্ম আনন্দের কারণ হয়। যদি তাহা না হইয়া থাকে তাহা হইলে আমল বষ্টকর বোধ হয়। হযরত নবী করীম (সাঃ) অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ ও আত্ম প্রসাদের অপর নাম ঈমান রাখিয়াছেন। সুতরাং যে পূর্ণ ঈমান লাভ করে তাহার সেই পূর্ণ আত্মপ্রসাদও হাসিল হইয়া যায়। যেমন কুরআন শরীফে আল্লাহতা'লা বলেন,

والنازعات غرقا والناشطات نشطا

অর্থাৎ, কতক লোক এরূপ হয় যাহারা কাজ করিতে করিতে উহাতে সম্পূর্ণ তন্ময় ও বিলিন হইয়া যায় এবং তাহাদের অন্তরের সকল গিরা খুলিয়া যায়। অতঃপর তাহারা ঐ কাজে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ অনুভব করিতে আরম্ভ করে। তারপর ফরমাইয়াছেন যে, এই সকল ব্যক্তিই পূর্ণ মুমেন। সুতরাং প্রকৃত ঈদ তখনই হয়, যখন মানুষ কর্মে আনন্দ অনুভব করিতে আরম্ভ করে এবং কাজকে বোঝা মনে করে না বরং যত বেশী খোদাতা'লার উদ্দেশ্যে তাহাকে কুরবানী পেশ করিতে হয়, অথবা মানুষের জন্য ত্যাগ শিকার করিতে হয়, অথবা নেযামে-সেলসেলার উদ্দেশ্যে তাহাকে কুরবানী দিতে হয়, এই সকল কুরবানী তত বেশী তাদের অন্তরে আনন্দ ও তৃপ্তির সঞ্চার করে, এ সকল বিষয়ের সুযোগ ঘটার জন্য কাজকে সে কষ্টকর বোধ না করিয়া বরং কর্মেই তাহার স্বাদ লাগে। এই মাকাম ও দর্জা কখনও অস্থায়ী হইয়া থাকে, আর কখনও স্থায়ী। যখন অস্থায়ী হয় তখন তাহার দৃষ্টান্ত সেই ঈদের ন্যায় হয় যাহা আসে এবং চলিয়া যায়। আর কাহারও জন্য একটি ঈদ আসে, কাহারও জন্য সপ্তাহে প্রতিটি ষষ্ঠ দিন ঈদ হয়, আর কেহ কেহ এমনও আছে, যাহার জন্য প্রতিদিনই ঈদের দিন হইয়া থাকে, কেন-না তাহার ঈদ চব্বিশ ঘন্টার দিনে আসে না, বরং তাহার জন্য আল্লাহতা'লা সেই দিনকে ঈদের জন্য নির্ধারণ করেন,

যে দিন সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন : فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون

অর্থাৎ খোদাতা'লার কতক কাজ এরূপ দিনেও হইয়া থাকে যাহা তোমাদের (মানুষের) গণনা অনুযায়ী এক হাজার বৎসরকালের সমান হইয়া থাকে। এমনি ধারায় কোন বুযুর্গ ছিলেন যিনি রাত দিন দীনের খেদমতে মশগুল থাকিতেন এবং নিজের রুজী উপার্জনের বিষয়ে কোন চিন্তা করিতেন না। অন্য এক বুযুর্গ যিনি তাঁহার মর্তবাকে জানিতেন না একদিন তাঁহাকে উপদেশ করিলেন যে, আপনার কিছু কাজও করা উচিত এবং পরিশ্রম করিয়া রুজী উপার্জন করা উচিত। তিনি বলিলেন, "দেখুন, সাহেব! আমি আল্লাহতা'লার মেহমান। যদি মেহমান নিজে খানা পাক করিতে আরম্ভ করে তাহা হইলে ইহাতে মেজবানের কিরূপ অবমাননা হইয়া থাকে? সুতরাং আমি যদি আমার রুজির সম্বন্ধে চিন্তা করি, তাহা হইলে আমার খোদা আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া পড়িবেন। সেই বুযুর্গও আলেম ছিলেন। ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, "আপনি তো কথা যুক্তি-সঙ্গতই বলিয়াছেন, কিন্তু রসূল করীম (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, মেহমানী তিন দিন হইয়া থাকে। আপনার মেহমানী তো এখন দীর্ঘ হইয়া গেল। সুতরাং ইহা মেহমানী আর থাকিল না বরং ইহা তো সাওয়াল বা ভিক্ষায় পরিণত হইয়াছে। প্রত্যুত্তরে তিনি বলিলেন, "সাওয়াল বা ভিক্ষা তাহাদের জন্য হইবে, যাহাদের দিন চব্বিশ ঘন্টার দিন হয়। আমি সেই দিনে বিশ্বাসী, যে দিন সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন : فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون সুতরাং যেদিন মেহমানদারীর তিন হাজার বৎসর পূর্ণ হইবে সেই দিন আমি আমার (রুজী উপার্জনের) কাজ আরম্ভ করিব" ইহার অর্থ এই ছিল যে, তিনি চিরকাল মেহমান স্বরূপই ছিলেন।

উল্লিখিত মাকামে উপনীত ব্যক্তি যাহাকে খোদাতা'লা বলিয়াছেন যে, এখন তোমার ঈদ আমি চিরস্থায়ী করিয়া দিয়াছি সে প্রত্যেক প্রকারের অধঃপতন হইতে সংরক্ষিত হইয়া যায়, কিন্তু কাজ তিনিও ছাড়িয়া দেন না। কেন-না এই মাকাম সেই ব্যক্তিকেই দান করা হয় কর্মেই যে স্বাদ পাইতে আরম্ভ করে।

যদি কোন ডাক্তার কোন রুগীকে পাঁচ মাস মর্ফিয়ার ইঞ্জেকশন দিতে থাকে, তারপর তাহাকে বলে যে, এখন ইহা ছাড়িয়া দাও, মর্ফিয়ার ইঞ্জেকশনের আর প্রয়োজন নাই। তাহা হইলে সেই রোগী মর্ফিয়ার ইঞ্জেকশন ছাড়িয়া দিতে পারে না, কেন-না উহাতে সে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু মর্ফিয়া বা আফিমের যে অভ্যাস উহার চাইতে হয়, তখন তাহাকে যত ইচ্ছা মার পিট করিলেও সে উহা ছাড়িতে পারে না। আপনারা কি দেখেন না যে, আল্লাহতা'লার নবীগণের উপর যাহারা ঈমান আনে বিরুদ্ধবাদীরা অতঃপর তাহাদিগকে কত মার-পিট করে, কত জ্বালাতন করে, গাল-মন্দ দেয়, বয়কট করে এবং বলে তাহার (নবীর) মজলিসে যাইবে না, কিন্তু যেমনি তাহারা (তাহাদের কবল হইতে) মুক্ত হয় সব কিছু ছাড়িয়া দিয়া তাহাদের নবীর নিকট ছুটিয়া যায়। এমন এমন দুঃখ-কষ্ট নবীগণের বিশ্বাসীদিগকে দেওয়া হইয়াছে, যে-গুলির কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে না। কিন্তু এই সকল বৃত্তান্ত হইতেই জানা যায় যে, যখনই তাহাদের হাত-পা মুক্ত করা হইয়াছে তখনই তাহারা ছুটিয়া

আবার তাহাদের নবীর দরবারে পৌঁছিয়া গিয়াছেন। হযরত আবুযর গাফ্‌ফারী (রাঃ)-এর দৃষ্টান্তই যেমন হাদীস-গ্রন্থাবলীতে পাওয়া যায়। যখন তিনি প্রথম প্রথম রসূল করীম (সাঃ)-এর উপর ঈমান আনেন তখন পর্যন্ত খুব কম সংখ্যক লোক (তাঁহার উপর) ঈমান আনিয়াছিল। প্রায় ষোল সতর জন মাত্র লোক ছিলেন যাহারা ইসলামে দাখিল হয়েছিলেন। তিনি (আবুযর) কোন মুসলমানের নিকট রসূল করীম (সাঃ) সম্বন্ধে শুনিয়া তাঁহার উপর ঈমান আনিয়া ফেলিলেন। কিন্তু নিবেদন করিলেন, "হে রসূলুল্লাহ! আমার গোত্রের লোক যেহেতু এখনও ঈমান আনে নাই, সেইজন্য আপনি আমাকে অনুমতি দিন যাহাতে আমি আমার ঈমানকে ততক্ষণ পর্যন্ত গোপন রাখি, যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারও ঈমান না আনে।" রসূল করীম (সাঃ) তাঁহাকে অনুমতি দান করিলেন। কিন্তু যখন তিনি রসূল করীম (সাঃ)-এর দরবার হইতে উঠিয়া বাহিরে আসিলেন, তখন দেখিতে পাইলেন যে, এক জায়গায় কাফেরদিগের মজলিস জমিয়াছে এবং মক্কার বড় বড় সরদারগণ রসূল করীম (সাঃ)-কে গাল-মন্দ দিতেছে। তখন তিনি তাহা আর বরদাশ্‌ত করিতে পারিলেন না এবং সজোরে বলিয়া উঠিলেন, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ।" যাহারা নিজেদের শক্তি ও ঐশ্বর্যের উপরও অত্যন্ত গর্বান্বিত ছিল, এরূপ ভয়ংকর শত্রুদের নিকট যখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে কলেমা পাঠ করিলেন, তখন কাফেরদের জোশ আসিয়া গেল এবং তাহারা তাঁহাকে এতই মার-পিট করিল যে, তিনি আহত হইয়া ধরাশায়ী হইয়া পড়িলেন। ঘটনাক্রমে হযরত আব্বাস তখন সেই দিক দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি কাফেরদিগকে বলিলেন, 'গাফ্‌ফার গোত্র হইতে তোমাদের নিকট শস্য আসিয়া থাকে। যদি তোমরা তাহাকে ছাড়িয়া না দাও এবং তাহার গোত্র তাহার পক্ষ সমর্থন করে, তাহা হইলে তোমাদের নিকট শস্য আসা বন্ধ হইয়া যাইবে এবং তোমরা না খাইয়া মরিবে। সেজন্য তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়াই শ্রেয়ঃ।" পরিশেষে বড়ই কৌশলে তিনি হযরত আবু যরকে তাহাদের কবল হইতে মুক্ত করিলেন। তিনি (আবুযর) ঘরে যাইয়া কয়েকদিন যাবৎ ঔষধ-পত্র করিলেন। যখন আরোগ্য লাভ করিলেন, তখন বাহির হইয়া আবার দেখিলেন যে, কাফেরদের আসর জমিয়াছে এবং তাহারা রসূল করীম (সাঃ)-কে গাল-মন্দ বলিতেছে পুনরায় তাঁহার জোশ আসিল এবং তিনি সজোরে বলিয়া উঠিলেন "আশহাদু আন্‌ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ও আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ।" তাহারা পুনরায় তাঁহাকে বেদম মার-পিট করিল এবং তাঁহাকে ভীষণভাবে ক্ষতবিক্ষত করিল। তিনি আবার গৃহে আসিয়া কয়েকদিন যাবৎ চিকিৎসা করার পর যখন বাহির হইলেন তখন অনুরূপ একটি মজলিসে তিনি উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার ইসলাম ঘোষণা করিলেন। মানুষে তাঁহাকে পুনরায় মার-ধর করিল। এখন লক্ষ্য করুন, উহা এক আস্বাদ ছিল যাহা তিনি উপভোগ করিতেছিলেন এবং উহার ফলশ্রুতিতেই তিনি বার বার তাঁহার মুসলমান হওয়ার ঘোষণা করিয়া যাইতে ছিলেন আর বারংবার মার খাইতেছিলেন। যদিও রসূল করীম (সাঃ)-এর পক্ষ হইতে তিনি অনুমতি পাইয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার মুসলমান হওয়ার বিষয় গোপন করিবেন, কিন্তু কর্মে আস্বাদ লাভের কারণে তিনি তাহা প্রকাশ্যে ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং প্রহার ভোগ করিয়াছিলেন।

তেমনিভাবে রসূল করীম (সাঃ)-এর যামানায় এক বালক ছিল। বার-তের বৎসর মাত্র তাহার বয়স। সে মুসলমান হইয়া গেল। তাহার মা-বাপের একমাত্র সন্তান ছিল সে। কিন্তু যেহেতু সে মুসলমান হইয়া গিয়াছিল এবং তাহার মাতা-পিতা ইসলামের ঘোর শত্রু ছিল সেজন্য যখন খাওয়ার সময় হইত তখন তাহার মা কুকুরের সামনে যেভাবে রুটি নিক্ষেপ করা হয় সেইভাবে তাহার সম্মুখে রুটি নিক্ষেপ করিয়া খাইতে দিত। পাত্রে রাখিয়া এজন্য খাবার দিত না যে, উহাতে পাত্র অপবিত্র হইয়া যাইবে। পরিশেষে যখন সে ইসলামে মজবুতীর সহিত কায়েম থাকিল, তখন মা-বাপ তাহাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিল এবং বলিল, হয়ত তুই মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নিকট যাওয়া ছাড়িয়া দে নয়ত ঘর হইতে বাহির হইয়া যা। সে গৃহ পরিত্যাগ করিল এবং যথাসম্ভব হাবশার (আবিসিনিয়ার) দিকে হিজরত করিয়া চলিয়া গেল। বহু বৎসর সে ফিরিয়া আসিল। তাহার মা যখন জানিতে পারিল, সে তাহাকে খবর পাঠাইল, 'আমি তোমার সহিত দেখা করিতে চাই, আমার সহিত আসিয়া দেখা করিয়া যাও।' স্বল্প বয়সের বাচ্চা ছিল যখন সে তাহার মাতা-পিতার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। তদুপরি সে তাহার মা-বাপের একমাত্র সন্তান ছিল। সে বহু বৎসর যাবৎ গৃহ হইতে বাহিরে থাকার কারণে ধারণা করিয়াছিল যে, হয়ত তাহার মায়ের মন এখন নরম হইয়াছে, কিন্তু যখন সে তাহার সহিত দেখা করিতে গেল, তখন সে তাহাকে সাদরে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল; "হে পুত্র! এখন তো আশা করি, তুমি ঐ সাহাবীর নিকট আর যাইবে না।" সেই যুবক সাহাবী তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট হইতে সরিয়া পড়িল এবং বলিল "হে মা! আমি তো মনে করিয়াছিলাম যে, আমার বহু দিন দূরে থাকার কারণে তোমার মন হইতে বিদ্বেষ তিরোহিত হইয়াছে কিন্তু তোমার অবস্থা তো পূর্ববৎই রহিয়াছে। আমি তোমার জন্য মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে ছাড়িয়া দিতে পারি না। এই বলিয়া সেই যুবক তৎক্ষণাৎ গৃহ ত্যাগ করিল। তারপর সে কখনও তাহার মায়ের মুখ দেখে নাই।

সুতরাং প্রকৃত ও সত্যিকার ঈদ উহাই, যেদিন মানুষ কর্মে আস্বাদ অনুভব করিতে আরম্ভ করে এবং সে খোদাতা'লার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক প্রকারের কুরবানীর আগুনে ঝাঁপাইয়া পড়িতে প্রস্তুত থাকে এবং কর্মচ্যুতি বা কর্মত্যাগের নিকটও ভিড়ে না। এই মাকাম যখন কোন ব্যক্তি বা জাতির হাসিল হয় তখনই সে বা তাহারা প্রকৃত ঈদের অধিকারী হয় এবং দীনি ও দুনিয়াবী উদ্দেশ্যাবলীতে সফলকাম হইয়া যায়। সুতরাং চেষ্টা কর যেন তোমরা এই ঈদের অধিকারী হইতে পার। এবং তোমাদের সর্বৈব আস্বাদ এবং সার্বিক আনন্দ ইহাতেই অনুভব হয় যে, তোমরা খোদাতা'লার জন্য নিজেদের সর্বস্ব ও সব কিছুই কুরবান করিয়া দাও এবং ইহাকেই ঈদ মনে কর। আল্লাহ্‌তা'লা তোমাদের সঙ্গে হউন এবং আমাদীগকে সেই ঈদের অংশীদার করুন, যাহা লাভ হইলে পর দুনিয়ার কোন দুঃখ-কষ্ট মানুষকে আর উদ্বিগ্ন করিতে পারে না।

(আল্ ফযল, ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৩ ইং হইতে অনূদিত)

(১৫ই আগষ্ট, ১৯৭৯ ইং তারিখে পাক্ষিকের ভলিউম থেকে পুনঃ মুদ্রিত)

ঐশী প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হল

আলহাজ্জ এ, টি, চৌধুরী

আমরা প্রতিদিন রেডিও টেলিভিশনে শুনি ইন্নাকা লা তুখলিফুল মিয়াদ—অর্থাৎ আল্লাহ্ কখনও প্রতিশ্রুতি বা অংগীকার ভংগ করেন না। আযানের দোয়ায় বার বার এই কথাটি স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে।

আজ থেকে শতবর্ষ পূর্বে ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ্ হওয়ার দাবীদার মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে (আঃ) আল্লাহ্ তা'লা জানিয়ে ছিলেন,—ম্যায় তেরি তবলীগ কো যমীনকে কিনারুঁতক পোঁহ্ চাউঙ্গা। অর্থাৎ—আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর কোণায় কোণায় পৌঁছে দেব (তায্কিরা-৩১২)। অন্য এক ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছে—ওহ্ তুঝে বহুত বরকত দেগা, ইহাঁতক কে বাদশাহ্ তেরি কাপড়ো সে বরকত ঢুণ্ডেঙ্গে (ঐ-১০ পৃঃ)। অর্থাৎ রাষ্ট্র প্রধানরা তাঁর বস্ত্র থেকে আশিস লাভ করবে। বলা হয়েছে—হরেক শাখ তেরে জদ্দি ভাইটকা কাটে জায়েগে (ঐ-১৪০ পৃঃ) অর্থাৎ—তোমার ভাইদের সকল বংশধারা লুপ্ত হয়ে যাবে। ওদের শাখা কর্তন করা হবে। অপর দিকে—তেরি নসল কিসরতসে মুলকুমে ফেল জায়েগী (ঐ) ম্যায় তেরি জুর্রিয়াতকো বহুত বারহাউঙ্গা আওর বরকত দোঙ্গা (ঐ) অর্থাৎ—আল্লাহ্ তা'লা মসীহ মাওউদের (আঃ) বংশধরাকে বৃদ্ধি করবেন এবং সমগ্র বিশ্বে বিস্তারিত করবেন। তাদেরকে কল্যাণমণ্ডিত করবেন।

ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের গুরুদাসপুর জেলার বাটালা তহসিলের অন্তর্গত কাদিয়ান একটি গ্রাম। এই গ্রামে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল বা কোন অফিস, প্রতিষ্ঠান ছিল না। বড় কোন বাজারও ছিল না। রেলওয়ে ষ্টেশন ছিল এগার মাইল দূরে। ঘোড়ার গাড়ীতে করে অথবা পায়ে হেঁটে মানুষ অতি কষ্টে দূর দূরান্তে সফর করত। গ্রামটি এমনই অনুন্নত ছিল যে, অনেকেই এই গ্রামের নাম পর্যন্ত জানত না। এই অখ্যাত অজ্ঞাত গ্রামের বাসিন্দা মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)। তিনি বলেছেন,—'এক যমানা থা কে মেরা নামভি মসতুর থা কাদিয়াঁ ভি থি নেহাঁ এয়সিকে গোয়া জেরেগার। কোই ভি ওয়াকেফ না থা মুঝসে নামেরা মুত্তেকাদ'। —এমন এক সময় ছিল যখন আমার নাম গুপ্ত ছিল। আর কাদিয়ানও যেন ছিল গুহার ভিতরের কোন স্থান। কেউ আমাকে জানত না, কেউ আমার অনুসারীও ছিল না। এরপর বলছেন, "উস যমানামে খোদানে দিথি শুহরত কি খবর।"—ঐ যুগে খোদাতা'লা তাঁকে প্রসিদ্ধির সংবাদ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—তাঁর প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দেবেন। এক অখ্যাত গ্রামের অজ্ঞাত ব্যক্তির এহেন দাবী নিয়ে তথাকথিত 'বুদ্ধিমান' লোকের হাসি-বিদ্রূপ করেছে। পাগলের প্রলাপ মনে করেছে। সমগ্র পৃথিবীতো দূরের কথা অখণ্ড ভারতের কোণে কোণে

এই মতবাদ প্রসার লাভ করছে, এ কথাও কেউ ভাবতে পারে নি। কারণ সহায় সম্বলহীন এক ব্যক্তি তাও আবার সমস্ত মৌলানা মৌলবী, পাদ্রী, পণ্ডিত, সমাজপতি যাঁর বিরুদ্ধে তাঁর প্রচার কি করে প্রসার লাভ করবে? বাটালার মৌলানা মোহাম্মদ হোসেন দুইশত বড় বড় মুফতীর ফতোয়া সংগ্রহ করে সমগ্র ভারতবর্ষে বিতরণ করলেন। যাতে কেউ কাদিয়ানে আসতে না পারে সেজন্য বাটালা ষ্টেশনে ছাত্রদেরকে নিয়ে প্রচারণা চালাতেন! মসীহ মাওউদের (আঃ) পাশের বাড়ীর তাঁর চাচাত ভাই মির্যা ইমামদীন, মির্যা নিযামদীনও আগত লোকদেরকে বিভ্রান্ত করতেন। জামে মসজিদে যাবার পথে দেয়াল উঠিয়ে বাঁধার সৃষ্টি করলেন। পাদ্রী এবং আর্য সমাজী পণ্ডিতেরা নানাভাবে মিথ্যা প্রচারণা দ্বারা জনগণকে উত্তেজিত করল। মিথ্যা মোকদ্দমা করে ব্যর্থ করে দিতে চাইল। মসীহে মাওউদ (আঃ) বলেন,

'কাফের ও মুলহেদ ও দাজ্জাল হামে কহতে হ্যায়
নাম কিয়া কিয়া গমে মিল্লাত মে রাখায়া হামনে।
... ...
'কৌম কি যুলুমসে তঙ্গ আকে মেরে পিয়ারে আজ
শোরে মহশর তেরে কুচামে মচায় হামনে।'

কাফের, দাজ্জাল খেতাব দেয়া হয়েছে তাঁকে জাতির পক্ষ থেকে সমাজের কাছ থেকে বহু গঞ্জনা তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে।

কিন্তু পরিণামে আল্লাহ্‌তা'লার প্রতিশ্রুতিই পূর্ণতা লাভ করল। আল্লাহ্‌তা'লা বলেছিলেন, ইন্না মুহিনুম মান আরাদা ইহানাতাকা—যারা তোমাকে অপমান করবে তারা অপমানিত হবে। ইন্না শানিআকা হুয়াল আবতার—তোমার শত্রুরা নির্বংশ হয়ে যাবে; 'সবর কর খোদা তেরে দুশমনকো হালাক করেগা (তাযকিরা দ্রষ্টব্য) সবুর কর, খোদা তোমার শত্রুদেরকে ধ্বংস করে দিবেন।

মোহাম্মদ হোসেন বাটালবী যে কুফরী ফতোয়া সংগ্রহ করেছিল, নিজেই কুফরী ফতওয়া প্রাপ্ত হয়ে অপদস্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করল। আজ তার কবরের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। বর্তমানে বাটালায় ছোট বড় কেউই তার নাম পর্যন্ত জানে না। তার কোন পুত্রের বংশধারা নেই। মেয়ের পক্ষে এক নাতী আহমদীয়াত গ্রহণ করে তাকে আবতার করে দিয়েছে। সানাউল্লাহ অমৃতসরীর একমাত্র যুবক পুত্রকে (হিন্দু শিখেরা) তারই সম্মুখে যবাই করে হত্যা করেছে। সাদউল্লাহ লুধিয়ানভীর দুই পুত্রই অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে নির্বংশ হয়ে যায়। আলেকজাণ্ডার ডুই, পণ্ডিত লেখরাম মোকাবেলা করে ধ্বংস হয়ে যায়। তাঁর চাচাত ভাই ইমামদীন, নিযামদীনের বংশধারাও সমাপ্ত হয়ে যায়। তাদের বাড়ী, দালান কোঠা আজ আহমদী জামা'তের প্রচার কেন্দ্র। অপরদিকে মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর সন্তান ও সন্তানের সন্তানরা আজ ইউরোপ, এশিয়া এবং আমেরিকার বিভিন্ন দেশে বসবাস করছেন। এদের সংখ্যা শত শত। রাষ্ট্র প্রধানরা তাঁর খলীফাদের (হাদীসে খিলাফতকে বস্ত্র বলা

হয়েছে) কাছ থেকে বরকত অনুসন্ধান করছেন। উল্লেখ্য যে এ যাবৎ তাঁর একজন পুত্র এবং দুই পৌত্র খিলাফতের আশিসমণ্ডিত পদে নির্বাচিত হয়েছেন। গাম্বীয়ার আহমদী রাষ্ট্র প্রধান স্যার মোহাম্মদ সিঙ্গাতে মসীহে মাওউদের (আঃ) একখণ্ড বস্ত্র গ্রহণ করে ভবিষ্যদ্বাণীকে আক্ষরিক ভাবেও পূর্ণতা প্রদান করেন।

এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা মহাদেশের একশত ত্রিশটি দেশে প্রায় পাঁচ হাজার জামা'ত বিস্তার লাভ করেছে। কোটি কোটি লোক আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে দাখিল হয়ে জান, মাল দ্বারা ইসলামের সেবা করেছেন। জ্ঞানে গুণে এই জামা'তের সদস্যরা বিশ্ব-দরবারে খ্যাতি লাভ করেছেন। অগণিত প্রচারক পৃথিবীর কোণায় কোণায় ইমাম মাহদী মসীহে মাওউদের (আঃ) বাণীকে পৌঁছে দিচ্ছেন। নানা মত ও পথের লোক এই জামা'তের মাধ্যমে প্রকৃত ইসলামে দীক্ষিত হয়ে ধন্য হচ্ছেন।

১৯৯২ সাল থেকে চালু হয়েছে মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া। লণ্ডন থেকে এই টি. ভি. এর মাধ্যমে পৃথিবীর পাচটি মহাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের আন্তর্জাতিক নেতা খলীফাতুল মসীহের (আইঃ) খুতবা ও দরস প্রচারিত হচ্ছে নিয়মিত। আকাশ পথে ভেসে আসছে মসীহে মাওউদের (আঃ) ছবি ও বাণী, কাদিয়ান সহ বিভিন্ন দেশের আহমদীয়া প্রচার কেন্দ্রের ছবি। এক কালের অখ্যাত গ্রাম কাদিয়ানের নাম জানে না এমন লোক হয়ত পৃথিবীতে আর নেই। শত্রু মিত্র সবাই কাদিয়ানের নাম জানে। মসীহে মাওউদ (আঃ) বলেছিলেন,

'লেকিন আব দেখকে চর্চা কিসকদর হ্যায় হর কিনার।
উস যমানা মে খোদানে দিথি শুহরত কি খবর
জুকে আজ পুরি হুয়ী বাদ আজ মুকুরে রুজগার'।
... ...
'আব জেরা সোচোকে কিয়া ইয়ে আদমিকা কাম হ্যায়?
ইস কদর আমরে নেহাঁ পর কিস বশরকো ইকত্তেদার?

কোন মানুষ কি অনাগত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে? কখনও নয়। কেবল আল্লাহ্ থেকে জেনেই এহেন ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়। টি.ভি.তে যখন মিনারাতুল মসীহ এবং মসীহে মাওউদের (আঃ) ছবি ভেসে আসে তখন মনে হয় যেন প্রতিশ্রুত মসীহ আকাশ থেকে অবতীর্ণ হচ্ছেন। মসীহ মাওউদের (আঃ) খলীফাকে যখন জীবন্ত রূপে দেখি এবং তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী ও কণ্ঠস্বর শুনতে পাই তখন আহমদীয়াতের সত্যতা দেদীপ্যমান রূপে জগতের সামনে ভেসে উঠে সমগ্র পৃথিবী বাসী এই দৃশ্য দেখতে পায় চব্বিশ ঘন্টা ব্যাপী। কারণ লণ্ডনে যখন অপরাহ্ন একটা তখন কোথাও রাত একটা, কোথাও ভোর, কোথাও সন্ধ্যা, কোথাও অন্য কোন সময়। এ যেন অহোরাত্র ব্যাপী অনুষ্ঠান। এসব দেখেও কি কেউ আহমদীয়াতের সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবে না? 'সাফ দিলকো কসরাতে এজায কি হাজত নেহি
এক নিশাঁ কাফি হ্যায় গর দিলমে হো খৌফে কিরদিগার।

স্বচ্ছ অন্তর হলে অধিক নিদর্শনের প্রয়োজন হয় না। খোদা-ভীতি থাকলে একটি নিশানাই যথেষ্ট।

আল্লাহ্‌তা'লা সবাইকে শুভ বুদ্ধি দান করুন, আমীন।

বাংলাদেশ-সংসদে পাকিস্তানী কালোআইন

—শহিদুল ইসলাম

"১৯৮৬ সালের অক্টোবরে পাকিস্তানে Criminal Law (Amendment) নামে একটি ফৌজদারী আইন প্রণয়ন করা হয় এবং ২৯৫/C ধারাটি সংযোজন করা হয়। সেখানে বলা হয় Whoever by words, either spoken or written or by visible representation or by any imputation innuendo or insinuation directly or indirectly, defiles the sacred name of the Holy prophet Muhammad (peace be upon him) shall be punished with death or imprisonment for life, and shall also be liable to fine "ভাবার্থ হল" আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর চরিত্রকে কেউ যদি মৌখিক বা লিখিতভাবে, কিংবা আকারে-ইঙ্গিতে বিকৃত করে, কিংবা কেউ যদি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাঁর পবিত্র নামে নিন্দাসূচক বাক্য উচ্চারণ করে, কিংবা তাঁর প্রতি কটাক্ষ করে, কিংবা তাঁর উদ্দেশ্যে বক্রোক্তি উচ্চারণ করে, তাহলে তাকে মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে এবং সেই সঙ্গে জরিমানা করা যাবে।' আইনী ভাষার বঙ্গানুবাদ করার বিপদ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন থেকেও অতি সংকোচের সঙ্গে উক্ত আইনটির ভাবার্থ আমি পাঠকদের সামনে উপস্থিত করলাম। অনুবাদে কোন ভুলত্রুটি হয়ে থাকলে তা আমার অপারগতার কারণে। সেজন্যে আমি পাঠকদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

ক্রিকেটামোদীরা বুঝবেন, উক্ত আইনটি অনেকটা এল,বি,ডাব্লিউ, (LBW) আউটের মত, যে আউট সম্বন্ধে সব সময়ে একটা সংশয় থেকে যায়। এই আউটের জন্যে একজন ব্যাটস্‌ম্যানকে সম্পূর্ণ বিচারকের মর্জির ওপর নির্ভর করতে হয়। একবার আউট দিলে ক্রিজ ছেড়ে না গিয়ে তার উপায় থাকে না। ফৌজদারী আইন যে এমন ধূসর বা অস্পষ্ট ভাষায় রচিত হওয়া উচিত নয়, সবাই তা স্বীকার করেন। ফৌজদারী আইনের ভাষা হতে হয় স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট। তা নাহলে সে আইনের অপপ্রয়োগ হতে পারে। সে আইনের ফাঁক-ফোকর দিয়ে প্রকৃত আসামী যেমন পার পেয়ে যেতে পারে, তেমনি নির্দোষ ব্যক্তিও কখনও কখনও কঠিন সাজা পেতে পারে। ঐ আইনটি পাশ হবার পর পাকিস্তানে তার অপপ্রয়োগের কিছু খবর আমরা পেয়েছি এবং তার বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক বিশ্বের প্রতিক্রিয়াও আমরা জেনেছি। ঐ আইনটি চালু হবার পর প্রথম আক্রমণটা আহমদীয়া মুসলমানদের উপর নেমে এলেও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তার প্রয়োগ কারো নজর এড়ায় না। ঐ আইনের অপব্যবহারের কয়েকটি নজির: (ক) কুমিল্লা বার্ডের সঙ্গে যাঁর নাম যুক্ত, সেই আখতার হামিদ খানকে হযরত মোহাম্মদের (সাঃ) বিরুদ্ধে অপমানজনক উক্তি করার অভিযোগে বিচারের সম্মুখীন হতে হয় এবং সুপ্রীম কোর্টের সামনে হাজির হয়ে তাঁকে নির্দোষ বলে প্রমাণ করতে হয়। ঐ আইনের জোরে যে কাউকে, যখন-তখন, যেখানে-সেখানে গ্রেফতার করে আদালতে সোপর্দ করা যায়। গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি নির্দোষ প্রমাণ করেই কেবল নিজেকে বাঁচাতে পারেন। এটা যে হয়রানিমূলক, সে বিষয়ে কারো কোন সন্দেহ থাকার কারণ নেই। (খ) একটি আহমদীয়া মুসলিম পরিবার তাদের ছেলে বা মেয়ের বিয়ের আমন্ত্রণপত্রের ওপর 'বিসমিল্লাহের রাহমানের রহিম' লিখেছিলেন। সেই অপরাধে পরিবারের সবাইকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। (গ) আহমদীয়া মুসলমানদের জন্যে ইসলামী ঐতিহ্যানুসারে কাউকে অভিনন্দন জানানো নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। কারণ তারা যদি কাউকে 'আস্‌সালামু আলাইকুম' কিংবা 'ইন্‌শাআল্লাহ' বলে তাহলে সেদেশের 'খাঁটি' মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে নাকি আঘাত লাগে। সে কারণে একটি আহমদীয়া-প্রধান গ্রামের বিরুদ্ধে ইসলামী আদব-কায়দা বা অনুষ্ঠানাদি না করার কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। ঐ আইনের ফলে সেখানে একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পক্ষে ধর্মীয় কর্তব্য-কর্ম পালন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে, এমন কি আল্লাহ-রসূলের নামোচ্চারণও তাদের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে ওঠে।

এটা যে কত বড় অত্যাচার আশা করি দেশবাসী তা উপলব্ধি করবেন। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার কাজে ঐ আইনের প্রয়োগে সে দেশের গণতান্ত্রিক শক্তি এবং সমগ্র গণতান্ত্রিক বিশ্ব বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। অত্যাচার সহ্যের সীমা অতিক্রম করলে একটি পরিবার সর্বোচ্চ আইনের আশ্রয় ভিক্ষা করে এবং গত ৬ই জানুয়ারী সে-দেশের আহমদীয়রা—ঐ অগণতান্ত্রিক ও মধ্যযুগীয় আইনের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে বড় ধরনের বিজয় অর্জন করে (The Daily Star 8.1.93,)। ঐ দিন পাকিস্তানের সুপ্রীম কোর্ট এক হতচকিত রায়ে আহমদীয় মুসলমানদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা স্বীকার করে। রায়ে বলা হয় যে, লাখ লাখ আহমদীয়া মুসলমান 'আসসালামু আলায়কুম' এবং 'ইনশাল্লাহ' ইত্যাদি ধর্মীয় অভিবাদন বা অভিনন্দন উচ্চারণ করতে পারবেন। ইসলামী মতে বিশ্বের আমন্ত্রণপত্র ছেপে যে পরিবারটি হযরত মোহাম্মদ (সঃ) নিন্দা প্রকাশ করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল, কোর্ট তাদের মুক্তির নির্দেশ দেয় এবং সেই গ্রামের মানুষের ওপর 'আল্লাহু রসূলের' নামোচ্চারণের ওপর যে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল, তা প্রত্যাহার করা হয়। বিচিত্র এই খবরে দেশবাসীর হাসির উদ্রেক হতে পারে, কিন্তু আরো হাজার হাজার মানুষ যারা ঐ আইনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত—নির্যাতিত, যারা নির্ভয়ে আল্লাহ্ রসূলের নামোল্লেখ করতে শংকিত; যাদের পক্ষে আইনের আশ্রয় নেয়া সম্ভব নয়, তাদের কথা চিন্তা করলে সে হাসি মুহূর্তে মিলিয়ে যাবে। ভাবুন তো এটা কত বড় ধর্মবিরোধী আইন, কত গণতন্ত্র বিরোধী? নোবেল পুরস্কার বিজয়ী প্রফেসর আবদুস সালাম যদি পাকিস্তানের কোন খাঁটি মুসলমানকে 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলে অভিবাদন জানান, তাহলে ঐ ব্যক্তি মর্মাহত হবেন এবং ইচ্ছে করলে তিনি প্রফেসর সালামের মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করতে পারেন। পৃথিবীর অন্য কোন দেশে কারো ধর্ম বিশ্বাসের ওপর এরূপ সরাসরি হস্তক্ষেপ করা হয় বলে আমাদের জানা নেই।

আধুনিক রাষ্ট্রে এ ধরণের আইন থাকতে পারে না। মত প্রকাশের স্বাধীনতা গণতন্ত্রের প্রধান শর্ত। ধর্ম পালনের অধিকারও তার অন্তর্ভুক্ত। ধর্মবিশ্বাস প্রতিটি মানুষের একান্ত আপনার নিজস্ব বিশ্বাস। যে-কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রত্যেককে তার ধর্ম পালনে অধিকার প্রদান করে। আইন করে তা কেড়ে নেয়া কেবল অগণতান্ত্রিক নয়, চরমভাবে মানবতা-বিরোধীও বটে। তাই এ্যামনেস্টি ইন্টার ন্যাশনাল, ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অব জুরিষ্ট এবং জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশন পাকিস্তানের ঐ আইনের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় নিন্দা জ্ঞাপন করেছে, এবং তা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে। এটাকে কালো আইন হিসেবে চিহ্নিত করে এশিয়ান টাইমস পত্রিকা ৯০-এর ৫ জুন সংখ্যায় মন্তব্য করে যে,

Such black laws of which there are many in Pakistan have been widely condemned by such well known organisation as the United Nations and Amnesty International

পাকিস্তানের ঐ কালো আইনটি বাংলাদেশে চালু করার জন্যে চলতি অধিবেশনে একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বন্ধু জামাত-ই-ইসলামীর নেতা মওলানা মতিউর রহমান নিজামী একটি বিল উত্থাপন করেছেন। সরকার বিলটি বিবেচনা করবেন, প্রতিমন্ত্রীর এ আশ্বাসে তিনি আপাতত বিলটি প্রত্যাহার করেন। আইন প্রতিমন্ত্রী মন্তব্য করেন যে, বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই সরকারী মহলে ব্যাপক আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। পাকিস্তানী অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায় যে, ধর্ম-ব্যবসায়ীরা কখনও মানুষের মঙ্গল কামনা করে না বরং সামান্য অজুহাতে, কিংবা কোন অজুহাত না পেলেও যেন মানুষকে বিপদে ফেলা যায়, তাদের ওপর অত্যাচার করা যায়, এমনকি বিনা দোষে মানুষের প্রাণ সংহার করা যায়, এটাই তাদের সার্বক্ষণিক চিন্তা। তাদের এই ঘৃণ্য উদ্দেশ্যে তারা সব সময় ধর্মের মনগড়া ব্যাখ্যা তৈরি করে সাধারণ ধর্মপ্রাণ মানুষকে বিপথগামী করতে চায়। একাত্তরের যুদ্ধে তাদের ভূমিকার কথা স্মরণ করুন। আপাতত প্রত্যাহৃত হলেও দুর্বল সরকার জামাতের চাপে যে কোন সময়ে বিলটি আইনে পরিণত করতে পারে। তাই সরকার ও বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্যদের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্যে পাকিস্তানের অভিজ্ঞতার কথাগুলো মনে করিয়ে দিলাম। আশা করি বিলটি আইনে পরিণত করার আগে সেগুলো গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবেন।

তা ছাড়াও প্রশ্ন তোলা যায় যে হঠাৎ নিজামী সাহেবদের এ আইনটির দরকার পড়লো কেন? তখনই কোন আইন প্রণয়ন করা হয়, যখন সমাজে তার প্রয়োজন দেখা দেয়। যেমন 'সন্ত্রাস দমন আইন'। এ আইনের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা গেলেও বলা যায় যে বাংলাদেশে সন্ত্রাসের বাড়বাড়ান্ত দেখে সরকার এ আইনটি প্রণয়ন করে। নিজামী সাহেবের বিল উত্থাপনে মনে হতে পারে যে বাংলাদেশের মানুষের যেন আর কোন কাজ নেই, যন্ত্রতন্ত্র যখন-তখন কোরআন হাদীস, আল্লাহ্-রসূলের নিন্দায় ব্যস্ত রয়েছে। সন্ত্রাস যেমন আজ কাউকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হয় না, ঘাড়ে এসে চেপে বসেছে বাংলাদেশের মানুষ কি তেমন কোন ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাচ্ছেন যারা কথায় কথায় কোরআন-হাদিসের অবমাননা কিংবা আমাদের প্রিয় নবীর বিরুদ্ধে কুৎসা রটিয়ে বেড়াচ্ছেন? তা যদি না পান তাহলে পাকিস্তানের সেই কালো আইনটি বাংলাদেশে চালু করার জন্যে জামাতীদের এত আগ্রহ কেন? এ প্রশ্নটি বিরাট হয়ে দেশবাসীর সামনে হাজির হয়েছে।

নিজামীর বিলটির ভাষ্য লক্ষ্য করুন: "Life imprisonment for willful desceration of the Quran or part of it and death sentence for defiling of the name of Prophet Muhammad (peace be upon him) by 'words' either spoken or written, or by signs, or visiable representation or by imputations or insinuation." পাকিস্তানী আইনের ভাষার সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষ্য করে দেশবাসী অবাক হবেন। নিজামী কেবল তাঁর প্রস্তাবে কুরআন বা তার অংশবিশেষের প্রতি 'ইচ্ছাকৃত' অবমাননার জন্যে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের প্রস্তাব করেছেন। পাকিস্তানী সহযোগীদের এহেন কাজে বিস্মিত না হয়ে এই অপ্রয়োজনীয় কালো আইন প্রতিরোধ দেশবাসীকে এগিয়ে আসার অনুরোধ করবো।

আর একটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ করে নিজামী সাহেবদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো। তা হল কুরআন-হাদীসের বিকৃত ব্যাখ্যা এবং মহানবী (সাঃ) সম্পর্কে ধৃষ্টতাপূর্ণ বক্তব্যের জন্যে দেশ-বিদেশের আলেম সম্প্রদায় জামাত-ই-ইসলামীকে দোষী সাব্যস্ত করেছে। এই মর্মে বক্তৃতা-বিবৃতি বা ব্যাখ্যা আজকাল প্রায়ই কাগজে প্রকাশিত হয়। কিছু বইপত্রও এ সম্পর্কে লেখা হয়েছে। দু'একটা উদাহরণ উল্লেখ করবো মাত্র। 'লন্ডন ভাষণে' মওদুদী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে

(অবশিষ্টাংশ ৩৬ পৃঃ দেখুন)

হাজার ফতোয়া আর সরকারী ঘোষণা আহম্মদীদেরকে অমুসলিম বানাতে পারবে না

—মুস্তফা আলী
ন্যাশনাল আমীর, আঃ মুঃ জাঃ

"আহমদীয়া মুসলিম জামাত নামে পরিচিত সম্প্রদায়কে ইদানিং বাংলাদেশে সরকারীভাবে অমুসলিম ঘোষণা করার জন্য দাবী উঠেছে। এই দাবীকে কেন্দ্র করে সভা সমিতি মিটিং মিছিল আজ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। মুসলমানদের মধ্যে বহু ফেরকা বা মতাবলম্বী আজ পৃথিবীর সব অঞ্চলায় বিদ্যমান। কিন্তু কাহাকেই সরকারীভাবে অমুসলিম ঘোষণার দাবী উঠে না, তবে শুধু আহম্মদীদেরকে কেন সরকারীভাবে অমুসলিম ঘোষণার দাবী উঠেছে এই দাবীর যৌক্তিকতা কি, এই সম্প্রদায়কে সরকারীভাবে অমুসলিম ঘোষণা করা হলে সাধারণ মুসলমানদের কি লাভ বা ক্ষতি তা পাঠক সাধারণের নিকট তুলে ধরার জন্য যারা এ দাবী তুলেছেন তাদের এবং আহম্মদীয়া মুসলিম জামাতের নেতৃবৃন্দের নিকট আমরা গিয়েছিলাম। এই দাবীর অগ্রনায়ক বিশিষ্ট কয়েকজনের মধ্যে জাতীয় মসজিদ আল-বায়তুল মোকাররম এর খতিব জনাব ওয়ায়দুল হক তিনি ওমরাহ পালনের জন্য মক্কায় আছেন, বিধায় তার মতামত সংগ্রহ সম্ভব হয়নি। দাবীর অন্য এক নেতা শাইখুল হাদিস জনাব আজিজুল হক এর নিকট আমাদের প্রতিনিধি গেলে তিনি ইত্যাদি ইত্যাদি অজুহাত দেখিয়ে আমাদেরকে এড়িয়ে যান। আহম্মদিয়া মুসলিম জামাতের ন্যাশনাল আমীর জনাব মুহাম্মদ মুস্তফা আলীর নিকট গেলে সহজ সরল বয়বৃদ্ধ এই ভদ্রলোক অত্যন্ত বিনয়ের সাথে তিনি তার বক্তব্য আমাদেরকে দেন এবং তার একান্ত সহকর্মী জনাব মতিউর রহমান তাকে এবং আমাদেরকে আন্তরিকভাবে সাহায্য করেন এজন্য তাকে ধন্যবাদ। যদি পরবর্তীতে, যারা আহমদীয়াদের সরকারীভাবে অমুসলিম ঘোষণার দাবী করেন তাদের বক্তব্য পাই তাহা পত্রস্থ করার ইচ্ছা রাখি।

রংবেরং :—আহমদীয়া মুসলিম জামাতকে সরকারীভাবে অমুসলিম ঘোষণার দাবী কেন উঠেছে? এ দাবীর যৌক্তিকতা কি?

ন্যাশনাল আমীর :—আল্লাহ ও রসূলের নাম ভাঙ্গিয়ে সরল প্রাণ ধর্মভীরু জনগণকে উত্তেজিত করে একটি ননইস্যুকে ইস্যুতে রূপান্তরিত করে নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করাই এই দাবীর মূল উদ্দেশ্য। সরকারী ঘোষণার মাধ্যমে কোন মানুষ যেমন মুসলমান হয় না তেমনি সরকারী ঘোষণা দ্বারা কেউ অমুসলমানও সাব্যস্ত হয় না। এক প্রশ্নের উত্তরে আন্দোলনকারী মৌলানা উবাইদুল হক সাহেব নিজেও এ কথা স্বীকার করেছেন যে, কোরআন হাদীসে এ ধরনের দাবী দাওয়ার কোন শিক্ষা নেই।

আহমদীরা মুসলিম জামাতকে সরকারীভাবে অমুসলমান ঘোষণার দাবী পাকিস্তান থেকে আমদানীকৃত। একটি চিহ্নিত মহল অতি ধূর্ততার সাথে বাংলাদেশে পাকিস্তানের ষ্টাইলে গোঁড়া ধর্মীয় উন্মাদনা চাপিয়ে দিতে সচেষ্ট। কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলন এই পরিকল্পনার প্রথম ধাপমাত্র। এতে সফলতা লাভের পর এদেশে এক নাগাড়ে ধর্ম ব্যবসায়ীরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করবে। বাংলাদেশের জাতীয় সত্ত্বাকে দ্বিধা বিভক্ত করার জন্য এর চেয়ে মারাত্মক আর কোন অস্ত্র নেই। কাদিয়ানী ইস্যুর পর যে একের পর এক নতুন নতুন ইস্যু খাড়া করবে পকিস্তানের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। তাই জনগণ এবং সরকারকে গোঁড়াতেই সতর্ক হওয়া বাঞ্ছনীয়। মুসলমানের সংজ্ঞা খুবই পরিস্কার। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন যে নিজের মুখে মুসলমান হবার দাবী করে সে মুসলমান। আরও বলেছেন, যে আমাদের মত নামায পড়ে, আমাদের কিবলা মুখী হয় আমাদের জবাই করা পশু ভক্ষণ করে, সে মুসলমান। কেবল মুসলমানই নয় বরং এমন মুসলমান যার দায়িত্ব আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল গ্রহণ করেছে। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র দায়িত্বে হস্তক্ষেপ করো না। আহমদীরা মুসলিম জামাত উপরোক্ত শর্তসমূহ ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ মান্য ও পালন করে। তাই হাজার ফতোয়া আর সরকারী ঘোষণা আহমদীদেরকে অমুসলমান বানাতে পারবে না। তাই আহমদীদেরকে অমুসলমান ঘোষণার দাবীর কোন যৌক্তিকতা নেই।

রংবেরং :—এদেশে কারা কিভাবে এ দাবী তুলছে?

ন্যাশনাল আমীর :—এদেশে একটি স্বার্থান্বেষী চিহ্নিত মহল এ দাবিটি তুলছে। মহলটি চেনার সবচেয়ে সহজ পন্থা সেই মৌলবাদী পত্রিকাদি ভাল করে লক্ষ্য করা যেগুলোতে কাদিয়ানী বিরোধী প্রচারনা নিয়মিতভাবে চালানো হয়।

রংবেরং :—এ দাবী বাস্তবায়িত হলে আপনাদের কি অসুবিধা হবে? আন্দোলনকারীদের কি সুবিধা হবে? দেশে জনগণের কি লাভ বা ক্ষতি?

ন্যাশনাল আমীর :-আমাদের অসুবিধা হলো যে, আমাদের মৌলিক অধিকার খর্ব হবে। আমরা যে ইসলাম ধর্মের অনুসারী সেকথা সরকারীভাবে অস্বীকার করা হবে। অর্থাৎ আমরা কোন ধর্ম মানি সে বিষয়ে আমাদের কথা চলবে না, চলবে সরকারের কথা। এই ঘোষণার সূত্র ধরে ধর্ম ব্যবসায়ী ও সুযোগ সন্ধানীরা আরও নানা ধরনের অত্যাচার চালাবে।

এ দাবী বাস্তবায়িত হলে সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হবে আপামর জনসাধারণের। আল্লাহ রসুলের নাম ভাঙ্গিয়ে ধর্ম ব্যবসায়ীরা তাদের উপর একচেটিয়া রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার করবে। গণতন্ত্রের ভীত ধসে পড়বে। জনসাধারণের কল্যাণের রাজনীতি ধর্মীয় উন্মাদনার স্রোতে বিলীন হয়ে যাবে। এক কথায় রাজনৈতিক বা রাজনীতি বলতে কিছু থাকবে না। থাকবে কেবল তথা কথিত নায়েবে রসুলেরা—প্রক্রিয়াশীল মৌলবাদীরা। তাতে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ব্যাহত হবে।

আন্তর্জাতিক বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হবে। এমনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল যেভাবে পাকিস্তান ও অন্যান্য জাতীয় সাম্প্রদায়িকতার নিন্দা করেছে বাংলাদেশেরও সেই দশা হবে। এরপরে একে একে শিয়া ও ওহাবী বিরোধী আন্দোলনও হবে। প্রতিক্রিয়াশীল মৌলবাদীরা

সরাসরিভাবে রাষ্ট্র ক্ষমতায় নিজেদের অধিষ্ঠিত করার সুযোগ পাবে। স্বার্থান্বেষী মৌলবাদীরা ধর্মীয় অনুভূতির উস্কানী প্রদান করে জনগণের মাঝে প্রভাব বিস্তার করে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করবে। তাই দেশের স্বার্থে এরূপ চক্রান্তকে সমূলে নস্যাৎ করার এখনই সময়। বর্তমানে দেশে একটি নির্বাচিত সরকার বিদ্যমান সেক্ষেত্রে এদের প্রতিহত করতে বাধা কিসের?

রংবেরং: যারা আপনাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করার দাবী তুলছে তাদের আপনারা কি ভাবে মুল্যায়ন করেন?

ন্যাশনাল আমীর: আন্দোলনকারীদের সম্বন্ধে আমাদের প্রতিক্রিয়া হলো এ ধরনের অযৌক্তিক উস্কানি সৃষ্টি করে তারা কেবল যে বিশ্ব ধর্ম ইসলাম এবং বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কেই কলঙ্কিত করছে তা নয় বরং তারা মুসলমান উম্মাহর ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বে বিরাট ফাটলও ধরাচ্ছে।

আমরা মুসলমান হিসেবে তাদের জন্য অত্যাচারিত অবস্থায় দোয়া করি। আল্লাহ যেন তাদের হৃদয় পরিবর্তন করে দেন, তাদেরকে সঠিক পথ অবলম্বন করার তৌফিক দেন। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) বিরোধীদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন: হে আল্লাহ! আমার জাতিকে হেদায়েত দাও, কেননা তারা জানে না যে তারা কি করছে। আমরাও সুন্নতে রসূল অনুযায়ী তাদের জন্য এই একই দোয়া করি। আমরা ধৈর্য্যের সাথে ঐ পথই অবলম্বন করছি এবং করবো যা তাদের সম্বন্ধে ইসলাম আমাদের গ্রহণ করতে শিখিয়েছে''।

(রংবেরং পত্রিকার ১০ই মার্চ ১৯৯৩ইং সংখ্যার সৌজন্যে।)

(৩৩ পৃষ্ঠার পর)

বলেন, "মোহাম্মদ (সাঃ) ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক নন" (পৃষ্ঠা ১) এবং হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) মানবীয় দুর্বলতামুক্ত নন অপরের কল্যাণ-অকল্যাণ তো দূরের কথা তিনি তো নিজেরও কোন কল্যাণ করতে অক্ষম (পৃষ্ঠা ১১)। তাছাড়া তর্জমানুল কুরআনে তিনি বলেছেন, মহানবী (সাঃ) মনগড়া কথা বলেছেন এবং নিজের কথায় নিজেই সন্দেহ করেছেন।" তাছাড়া "কুরআনের মনগড়া ব্যাখ্যা করা জায়েজ এবং পুরাতন তাফসীর থেকে ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত নয়" বলেও তিনি মন্তব্য করেছেন বলে জানা যায়। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে মওদুদী অনেক সুরার বিকৃত ব্যাখ্যা করেছেন বলে অনেক আলেম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাই নিজামীদের সাবধান করতে চাই যে, উপরের বিল যদি আইনে পরিণত হয়, তাহলে তার প্রথম শিকার আপনারাও হতে পারেন। বাংলাদেশ সরকারের উপর আপনাদের যে নিয়ন্ত্রণ, তা চিরস্থায়ী ভাবা ঠিক হবে না। ক্ষমতার পালা বদল গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সুবিধাগত অবস্থার পরিবর্তন হলে, ঐ আইনের খাঁড়াটি আপনাদের ঘাড়েও পড়তে পারে। তখন দুঃখ করার সময় নাও পেতে পারেন। তাই আপনারাও সাবধান হোন"।

(১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩ তারিখের দৈনিক ভোরের কাগজ-এর সৌজন্যে)

যোগ্যতা

কে, এম, মাহমুদুল হাসান

বাবা মা লেখাপড়া লেখানোর আশায় ছেলেদের বিদ্যালয়ে পাঠান। কিন্তু এসব ছেলের সবাই কি লেখাপড়া শিখতে পারে? কেউ মার্বেল আর ডাংগুলি খেলে শৈশবেই লেখাপড়া শিকোয় তুলে দেয়। কেউ বা পড়ার বদলে বোমা বন্দুক চর্চা করে মাস্তানিতে লিপ্ত হয় এবং নিজের ও অন্যের লেখাপড়ায় বড়ই অবনতি ঘটায়। তাই বাবা মার সামর্থ্য থাকলেও এবং বিদ্যাপীঠে গেলেও শিক্ষা সবার ভাগ্যে জোটে না। শিক্ষা অর্জনের জন্যে নিজের যোগ্যতা থাকতে হয়।

বিশ্ব নবীর (সাঃ) বিশ্বজয়ী শিক্ষাকে অবহেলা করার ফলে বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের অধোযাত্রা যে চরমে নেমেছে তা দেখলেও ওপরের কথাগুলো সত্য বলে মনে হয়। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেছেন, "ইন্নাল্লাহা ইউহেব্বুল্লাযিনা ইউকাতেলুনা ফি সাবিলেহী সাফ্ফান কাআন্নাহুম বুনইয়ানুম মারসুস"। (সূরা আস্ সাফ্স—৫)। অর্থাৎ "নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদেরকে ভালবাসেন যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধ হয়ে এমনভাবে যুদ্ধ করে যেন শীশা গলিত প্রাচীর।" রসূল (সাঃ) বলেছেন, "দোয়া ভালবাসা ও আবেগের ক্ষেত্রে মোমেনের উদাহরণ হলো, মানবদেহের মত, যার একটি অঙ্গ অসুস্থ হলে অন্য সব অঙ্গও ব্যাথা, বেদনা, অনিদ্রা এবং জ্বরে ভুগবে।"

অথচ আজ মুসলমানদের কোথায় সেই একতা, কোথায় শীশা গলিত প্রাচীর, আর কোথায় এক দেহ? যেই মুসলমান এককালে ফ্রান্সে গিয়ে পৌঁছেছিল, স্পেন, আল-বেনিয়া ছাড়িয়ে বুলগেরিয়া, মেসিডোনিয়া ও সার্বিয়া অব্দি গিয়েছিল, তাদের আজ কি মর্মান্তিক অবস্থা। আজ মুসলমানদের চির শত্রু ইসরাঈল দুনিয়াবাসীর নাকের ডগায় যাবতীয় অপকর্ম ও করছে আবার জাতিসংঘকেও বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাচ্ছে, এমন কি ধমক দিচ্ছে (দেখুন Israel Warns UN to Back off ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন, ৯, ১০ জানুয়ারী, ১৯৯৩ইং) এতে কেউ কিছুই বলছে না। অথচ ইরাক নিজ দেশে নিজের বিমানই উড়াতে পারে না এই জাতিসংঘের দাপটে। আজ বসনিয়ার মুসলিম নারীদেরকে ধর্ষণ করতে করতে হত্যা করা হচ্ছে। পুরুষদের যবাই করা হচ্ছে। মা-মেয়ে নির্বিশেষে মুসলিম নারীদের প্রকাশ্যে গণধর্ষণ করে মারা হচ্ছে। এমন লোমহর্ষক অনাচার সেখানে হচ্ছে কলম যা লিখতে দ্বিধাগ্রস্থ হয়। আকাশ কান্নায় ভারী হয়ে আসে। কান্না আসে না শুধু তথাকথিত মানবাধিকারবাদীদের। তারা সার্ব বাহিনীকে বসনিয়া দখল করার জন্য নানা উপায়ে সময় ক্ষেপনের সুযোগ করে দিচ্ছে। তারা মুসলিম নিধন সফল করে সেখান থেকে মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার সুবিধার্থে সব ব্যবস্থাই পাকাপোক্ত করেছে। অথচ বসনিয়ার

মুসলমানদের আত্মরক্ষার্থে অস্ত্র সংগ্রহের সুযোগ নেই। কারণ তাদের মাথার ওপর ঝুলছে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞার খাঁড়া।

আজ দম্ভের সাথে সার্ব জেনারেল ফুস্তিক বলেছেন, 'ইউরোপ থেকে মুসলমানদের অস্তিত্ব খতম করাই আমাদের উদ্দেশ্য। বসনিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণাকারী মুসলমানদের উচিত, ইসলাম ত্যাগ করে সার্ব কিংবা ক্রোট খ্রীষ্টানে পরিণত হওয়া। তাদের তৃতীয় বিকল্প হচ্ছে মৃত্যু"।

সার্ব তথ্যমন্ত্রী বিলিবোর উস্কুইতম বলেছেন, "আমরা ইউরোপকে ইসলাম থেকে রক্ষার জন্যে নতুন ক্রুসেড-যুদ্ধের পতাকা উড়িয়েছি। আমরা বিশ্বব্যাপী ইসলামের নিয়ন্ত্রণ লাভের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি। কেন-না বিশ্বব্যাপী খ্রীষ্টরাজ সংকুচিত হয়ে আসছে, আর প্রত্যেক জায়গায় ইসলাম বেড়ে চলছে।"

উস্কুইতম সাহেবদের জানা নেই যে, সংকুচিত হয়ে আসাটা খ্রীষ্টবাদের কপালের লিখন। আর বিজয় ইসলামের জন্যই নির্ধারিত। বিশ্বজগতের প্রতিপালক ঘোষণা করেছেন, "তারা কি দেখেনা যে, আমরা ভূপৃষ্ঠকে তার প্রান্তসমূহ থেকে সংকীর্ণ করে আনছি ? বস্তুতঃ আল্লাহ্ আদেশ দান করেন, কেউ তার আদেশ বদলাতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে তিনি হিসেব গ্রহণে তৎপর।" (সূরা : আর রাদ—৪২)।

কিন্তু সবচে' লজ্জার বিষয় হলো মধ্য প্রাচ্যের ধনাঢ্য রাজা মহারাজারা মুসলমানদের এই মহাদুর্দিনে রা'টি পর্যন্ত করার সাহস রাখেন না।

ইসলামের প্রদীপ প্রশান্ত মহাসাগরে ডুবে গেলেও; তারা সাগর তীরে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখতে রাজী। কিন্তু এ প্রদীপ উদ্ধারের কোন চেষ্টাই করতে তারা রাজী নন, পাছে মানবাধিকারবাদীদের মনে কষ্ট হয়। আল্লাহ কষ্ট পেলেন কিনা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই তাদের। কিন্তু আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত এবং তার নেতা (আইঃ) এগিয়ে এসেছেন নির্ভীকভাবে যেটুকু সামর্থ্য আছে তাই নিয়েই বসনিয়াসহ দুনিয়ার অন্যান্য নির্যাতিত মুসলমানদের সাহায্যে।

আর ধনাঢ্য এসব রাজা বাদশারা ইসলামের বিজয়াভিযানে শরীক হবেনই বা কি করে ? এঁরা কি ধরেছেন শক্ত করে খোদার রজ্জু ? এঁরা কি হয়েছেন এক নেতার অধীনে জামাত বদ্ধ—যেমনটি আল্লাহ্ চেয়েছেন ? আল্লাহ্ বলেছেন, "ওয়া তাসীমু বি হাবলিল্লাহে জামিয়া ওয়ালা তাফাররাকু"। (সূরা : আলে ইমরান—১০৪)। অর্থাৎ-"এবং তোমরা সকলে সমবেত-ভাবে আল্লাহ্র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধর এবং তোমরা পরস্পর বিভক্ত হয়ো না।"

এদের ধনদৌলত আছে অফুরান। কিন্তু নেই খোদা-ভীতি। নেই যোগ্যতা আল্লাহ্র প্রেরিত পুরুষকে মেনে ইসলামের সেবায় আত্মনিয়োগ করা। তাই বিজয়াভিযানে

আল্লাহ্ এদের কাছ থেকে সামান্য সাহায্য নেয়ারও প্রয়োজন বোধ করেন নি। বরং সেই দুর্বল জামাতকে এই কাজে লাগিয়েছেন যার কাছে নেই কোন ধনবল নেই কোন জনবল বা রাজ্যবল। তবে আছে শুধু আল্লাহ্র মহান অস্তিত্বের সামনে আত্মসমর্পণের কারণে অদম্য আস্থা ও মনোবল। তাই, এই ক্ষুদ্র জামাতের বিরাট আত্মত্যাগ ও মনোবলের সামনে জনবল, রাজ্যবল, বা ধনবল সবই তুচ্ছ। মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "কিন্তু তারা যদি ফিরে যায়, তাহলে তুমি বল, আল্লাহ্ই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি ছাড়া কোন মাবূদ নাই। তাঁরই উপরে আমি নির্ভর করি এবং তিনি মহা আরশের অধিপতি।" (আত্ তাওবা—১২৯)।

আল্লাহ্র মহান অস্তিত্বের সামনে নিজের আমিত্বকে বিসর্জন না দিলে আত্মসমর্পণের ইচ্ছেই মনে জাগবে না। আল্লাহ্র ইচ্ছে অনুযায়ী লীশা গলিত প্রাচীর গড়ার জন্যে যে মনোবল প্রয়োজন তা অর্জন করতে হলে এই যোগ্যতাটুকু থাকলেই হবে। এই নীতির উপর ভিত্তি করে মুসলিম বিশ্ব একটু বিলম্বে হলেও ঐক্যবদ্ধ হবে ইনশাআল্লাহ্।

ঈদুল ফিতরের মোবারকবাদ

দীর্ঘ একমাস কঠোর সিয়াম সাধনার পর এসেছে পবিত্র ঈদুল ফিতর। এ ঈদ উপলক্ষ্যে আমি বাংলাদেশের সকল আহমদী এবং বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণকে জানাই আমার আন্তরিক মোবারকবাদ। আমরা এবার এমন এক প্রেক্ষাপটে ঈদ উদযাপন করতে যাচ্ছি যখন দেশে আমাদের ওপরে চলছে নির্যাতন ও আমাদেরকে 'অমুসলমান' ঘোষণার দাবী উঠেছে আমাদেরই দেশবাসী কতিপয় মোল্লা-মৌলবীদের তরফ থেকে। আইন করে যে কারও ধর্ম নির্ণয় করা যায় না তাদের এ বোধোয়ের জন্যে আমরা এ শুভ দিনে পরম করুণাময়ের নিকট কাতর প্রার্থনা করি।

বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে যে সব মুসলমান ভাইয়েরা নেতা হারা পথ হারা হয়ে যুলুম অত্যাচারের শিকার হচ্ছে বিশেষ করে বসনিয়ার মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ, আমরা আজ তাদের সকলকে স্মরণ করি। তাদের সকলের দুঃখ ও বেদনার সাথে আমরা একাত্মতা ঘোষণা করি। আমরা বিশ্বাস করি সেদিন বেশী দূরে নয় যেদিন সারা দুনিয়ার মুসলমানগণ ঐশী প্রেরিত নেতার নেতৃত্বের ছায়াতলে একতাবদ্ধ হবে এবং সকল প্রকার যুলুম ও নির্যাতনকে পদদলিত করে বিশ্বে তাদের মর্যাদার আসন সু-প্রতিষ্ঠিত করবে। প্রকৃতপক্ষে সেদিনই সারা দুনিয়ায় প্রকৃত ঈদের সুখ আমরা উপলব্ধি করবো। আল্লাহ্ করুন সে শুভ দিন যেন শীঘ্র আমরা লাভ করি।

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

ওয়াকেফীনে নওদের বৈশিষ্ট্যাবলী

ওয়াকেফীনে-নওদের প্রতি পিতামাতার দায়িত্ব ঃ

পিতামাতার দিক-নির্দেশনার জন্য হুযুর (আইঃ) নীচের বিষয়গুলো উল্লেখ করেন,

"এই ধরনের সন্তানদের প্রতি খুব সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য রাখা পিতামাতার একান্ত কর্তব্য। তাদের সন্তানদের প্রশিক্ষণের কতকগুলো বিশেষ দিকের প্রতি তাদের বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে— একটু পরেই আমি তা ব্যাখ্যা করছি। যদি আল্লাহ্ না করুন, তারা এমন কোন পূর্বাভাষ জানে যে, এই পরিকল্পার জন্য সন্তানটি অনুপযুক্ত বিবেচিত হচ্ছে সেক্ষেত্রে আমি বলবো তারা যেন সততা ও খোদাভীতির সাথে জামাতকে সত্যিকার অবস্থাটি জানান। এজন্যে তাদের কোন দোষ ধরা হবে না কেন-না তারা তো আন্তরিকতার সাথেই আল্লাহ্র খাতিরে তাদের উপহার উপস্থাপন করেছিলো কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সন্তানটি তার উপযুক্ত সাব্যস্ত হয়নি। এর পরেও যদি জামাত সন্তানটি চায় তাহলে মা বাবার দায়িত্ব সেখানেই শেষ। আর না হলে এই ছেলের ওয়াকফ বাতিল করা যেতে পারে। ওয়াকেফীনে নওদের প্রশিক্ষণের জন্য সত্যিকার গুরুত্ব দিয়ে এই নীতিই আমরা গ্রহণ করেছি"।

(হুযূরের জুমুআর খুতবা : ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৯)

ওয়াকেফীনে-নও ও শৈশবের নৈতিক শিক্ষা ঃ

হুযূর (আইঃ) বলেন,

"আমরা চাই ওয়াকেফীনরা যেন শৈশব থেকেই তাদের মেজাযকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে। যারা তাদের চেয়ে কম অবহিত তাদের প্রতি ওয়াকেফীরা যেন কখনো তাদের ঘৃণা প্রকাশ না করে। তাদের সেই সৎ সাহস থাকা দরকার যেন খুব মন্দ কথা শুনেও তারা নিজেদের শান্ত রাখতে পারে। কেউ যদি কোন কিছুর ব্যাখ্যা চায় তাহলে তারা যেন তাড়াহুড়ো না করে প্রয়োজনীয় চিন্তার পরই উত্তর দেয়। এগুলো সবই তাদের প্রশিক্ষণের ও অভ্যাসের অংশ যা তাদের মধ্যে খুব ছোট্ট বেলা থেকে প্রবেশ করিয়ে দিতে হবে। যদি খুব ছোট্ট বেলায় এগুলো তাদের অভ্যাসের মধ্যে শক্তভাবে প্রবেশ করিয়ে দেয়া না যায় তাহলে জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে হয়তো তারা অনেক বড় পণ্ডিত হতে পারে কিন্তু তারা জীবনের মৌলিক ও ব্যবহারিক দিকে নিম্নতম পর্যায়ে অবস্থান করতে থাকে"।

(হুযূরের জুমুআর খুতবা : ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৯)

পরিচালক : মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

আদরের ছোট ছোট ভাই ও বোনেরা আমার!

আস্ সালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু। আশা করি পরম করুণাময়ের ইচ্ছায় সবাকে নিয়ে ভালই আছো। দেখতে দেখতে পবিত্র ও বরকতপূর্ণ রামাযান মাস শেষ হয়ে এলো। এরপর পশ্চিম আকাশে তোমাদের মিষ্টি হাসির মত শুঠবে বাঁকা এক ফালি ঈদের চাঁদ। আগেভাগেই তোমাদেরকে ঈদের মোবারকবাদ জানিয়ে রাখছি কিন্তু। আমার ঈদের সালাম ও মোবারকবাদ অবশ্যই সবাকে বিলিয়ে দেবে এই আব্দার থাকলো তোমাদের কাছে।

রোযার কঠোর সাধনার পরে আসে ঈদ। এ ঈদ কাদের জন্যে জানোতো। যারা সারা মাস অতি কষ্ট করে খোদা-ভীতির সাথে রোযার নিয়ম কানুন মেনে তবে রোযা রেখেছেন আর কুড়িয়েছেন আল্লাহ্ র অশেষ অনুগ্রহ ও আশিস। রোযা রাখতে পারনি বলে তোমাদের দুঃখ পাওয়ার কোন কারণ নেই। বড় হয়ে তোমরা রোযা রাখবে এ সংকল্প তোমাদের থাকলেই আল্লাহ্তা'লা তোমাদের প্রতি খুশী হবেন। রোযার সময় তোমরা যদি আব্বা আম্মাকে অযথা কষ্ট না দাও, মিথ্যা কথা না বল, গালাগালি ও মারামারি না কর তাহলেই রোযার বড় একটা অংশ তোমরা লাভ করবে।

এবারের সংখ্যায় তোমাদের জন্যে রয়েছে সেলিম ভাইয়ের একটি লেখা। তোমরা মনোযোগ দিয়ে পড়বে, কেমন। আজ তবে এখানেই শেষ করছি। ঈদ মোবারক আবারও।

ওয়াস্ সালাম

তোমাদের নানা ভাই

ছোটদের ডায়েরী

ছোট্ট বন্ধুরা আমার,

অনেক অনেক সালাম আর আদর নাও সবাই। নতুন ক্লাসের নতুন বইতে নতুন নতুন ছড়া, কবিতা, গল্প পড়ে পড়ে বেশ মজা লুফছো, তাই না? কি শীতটাই না গেল এবার বলে! দক্ষিণ দিক থেকে ভালো লাগা দারুন ঝিরঝিরে হাওয়াও কিন্তু বইতে শুরু করে দিয়েছে তড়িঘড়িতেই। বন্ধুরা জানো! তোমাদের মতো অমনি সুন্দর, সজীব ও সুরভীময় আরো দু'টি একটি বিমল-নিখাদ জিনিসও কিন্তু আল্লাহ্ এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন—

আমাদের আশপাশ চমৎকার করে সাজানোর জন্যে, আমাদের আনন্দ-আন্‌জাম দেয়ার জন্যে। যেমন ধরো ফুল, এখন কতো কতো ফুটবে লাল, নীল, বেগুনী, হলুদ আরো কতো চম্‌কি-গম্‌কী রঙের। পলাশ-শিমুল-কৃষ্ণচূড়ায় ফুলকি লালে রাঙিয়ে যাবে আমাদের এ দেশ জোড়া বাগানখানি। আর এই যে পাখী কিচা কিউ কিক কুহু মিষ্টি তানে দিগ্‌ বিদিগ যখনি মুখর করে তোলার জোগাড় ছোট্ট বন্ধুরা! তখনি তোমাদের খুউব মনে পড়ে গেলো।

বন্ধুরা শুনো, এ পৃথিবীর আর সবার থেকে আমরা আহমদীরা কিন্তু অনেক অনেক এগিয়ে আছি। কেমন করে? অত্যন্ত মূল্যবান জিনিস সময়কে আমরা চিনে ফেলেছি অর্থাৎ হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এসে গেছেন আর আমরা তাঁকে চিনে-জেনে আল্লাহ্‌র নিকট থেকে নিয়ে আসা সময় উপযোগী কাজের আদেশে মাঠে নেমে পড়েছি। যারা এখন তাঁর আসার খবর শুনেনি বা শুনেও যারা চিনতে, গ্রহণ করতে পারেন নি তাদের সবার থেকে আমরা এগিয়ে আছি না? ধরো আমেরিকার লোকজন যদি আরও একশো বছর পরে ইমাম মাহদী (আঃ)কে গ্রহণ করে, তাহলে বলা যায়, দরিদ্র অনুন্নত দেশের নাগরিক হয়েও চিন্তা-চেতনায় আমরা আমেরিকা হতে একশো বছর এগিয়ে আছি। তাই আমাদের সবদিক থেকেই এগিয়ে থাকতে হবে—যেমন একটি দিক হলো পড়াশুনা। এখন তো আর সেই সময় নেই যে, মহারাজ ঢাক পিটালেন যে ব্যক্তি কুয়োর ছায়া দেখে উপর দিকে তীর ছুঁড়ে নির্দিষ্ট পাখী ঘায়েল করতে পারবে রাজকন্যা ও অর্ধেক রাজত্ব সে পাবে। এখন সবখানেই প্রতিযোগিতা খুব-জ্ঞান, মেধা আর যোগ্যতার। তাই বলছি, এখন যারা স্কুলে ভালো করবে, তারাই একই ধারায় প্রচেষ্টায় কলেজে, উচ্চ শিক্ষায় ও শেষে কর্ম জীবনেও ভালো করতে পারবে নিশ্চয়।

বড়ো-সুনামী, যারা ভালো করেছেন তাদের অনেকেই ভালো করার পেছনে একটি অভ্যেসের কথা বলেছেন। সেটি হলো সম্মানিত শিক্ষক ক্লাসে পড়ানোর আগেই বিষয়টি অন্ততঃ একবার পড়ে নেয়া। শিক্ষক মহোদয় যখন ক্লাসে পড়াবেন, তখন তোমার দ্বিতীয়বার শোনা হচ্ছে এবং বাড়ীতে নিজে যখন পড়বে তখন তৃতীয়বার জানা হবে। এই তিন জায়গায়ই যদি তুমি মনোযোগী হতে পারো—বুঝা, আয়ত্ত করা ও প্রকাশ করার জন্যে তোমার প্রস্তুতি সম্পন্ন। আর তা করতে হলে সময়কে অবশ্যই বাঁচিয়ে নিতে হবে বেহুদা কাজ থেকে। এমনটি করে দিনকে দিন একটানা মনোযোগী প্রচেষ্টার সঞ্চয় তোমার মধ্যে জন্ম দেবে এমটি জয় করার শক্তির—যাকে কঠিন কথায় বলে প্রতিভা, যার যাদুর স্পর্শে বিশ্ব এসে যাবে তোমাদের পায়ের তলায়। আমাদের প্রিয় খলীফা (আঃ) বলেছেন যে, আগামী শতাব্দীতে 'প্রফেসর আবদুস সালাম' আর 'স্যার মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খাঁন

সাহেবের মতো এমনি একশত ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি হবে। হওনা তোমরাও তাঁদের কেউ কেউ।

বন্ধুরা আমাদের স্রষ্টা আল্লাহ্ সবাইকে যার যার কাজ ঠিক করে দিয়েছেন। যেমনটি বলেছি—ফুলের কাজ গন্ধ—বাহার ছিটানো, ফল-বীজ তৈরী; পাখীর কাজ মিষ্টি গান শুনানো, ডিম মাংস (হাঁস-মুরগী) দেয়া। তেমনি আমাদের, মানুষদেরও দেয়া হয়েছে আবশ্যকীয় ও ঐচ্ছিক অনেক কাজের দায়িত্ব। সেই কাজগুলো সময় মতো সঠিকভাবে করেই আমরা বড়ো হতে পারি অনেক। আমাদের এ পৃথিবীর দুই তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ৪০০ কোটি লোকই তাদের প্রয়োজনীয় সবকিছু ঠিকমতো পায় না। আমাদের এদেশে লক্ষ লক্ষ লোক দু'বেলা খেতে পায় না, কতলোক গরম কাপড়ের অভাবে এ শীতেও মারা গিয়েছে, রাতে ঘুমানোর ঘরই নেই অনেকের—তাদের জন্যে অনেক কিছু করে অনেক বড়ো হওয়ার ব্যাপক সুযোগ রয়েছে আমাদের। আগেও বলেছি বড়ো হওয়া মানে মানুষসহ সকল সৃষ্ট জীবের সেবা করার যোগ্যতা, সামর্থ্য ও উন্নত মানসিকতা অর্জন করা। এই সেবা যে যতো বেশী করতে পারো—নিশ্চয় জেনো সে ততো বড়ো।

মানুষ আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ ভুলে গিয়ে বার বার কতো দুঃখ-কষ্ট বিপদেই না পড়েছে। ধ্বংস হয়ে গিয়েছে বড়ো উন্নত উন্নত জাতি—লূত, আদ, সামুদ, তুব্বা, ফিরাউন, নূহের জাতিসহ আরো কতো নাম না জানা যালেম—(অন্যায়কারী) জাতি। আল্লাহ্ সবচে' বেশী মায়া-দয়াশীল হলেও যে লোক অন্যায় করে জেনে-বুঝে করতেই থাকে, তাকে এমনই সাজা দেন যে, তোমরা তা ভাবতেই পারবে না। দোযখে তার সবচেয়ে ছোট যে শাস্তি তা'হলো এমনই গরম এক আগুন—যা পায়ের তলায় ছোঁয়ানো মাত্রই মাথার মগজ টগবগ করে ফুটে বের হয়ে আসবে—আর এ পৃথিবীতেও তাদের জন্যে অনেক অনেক লাঞ্ছনা রয়েছে। আল্লাহ্ বলেছেন:—

"বল: তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে ভ্রমণ কর, অতঃপর দেখ (সত্যকে) মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান-কারীদের পরিণাম কি হয়েছিলো?" (৬:১২) "এবং কত জনপদ ছিল যেগুলোকে আমরা এমতাবস্থায় ধ্বংস করে দিয়েছি যখন তারা যুলুমে লিপ্ত ছিলো, ফলে ঐগুলো নিজ ছাদের উপড় পড়ে রয়েছে এবং কত পরিত্যক্ত কুপ ও সুদৃঢ় কিল্লা (যেগুলোকে আমরা ধ্বংস করেছি) (২২:৪৬)।

ছোট বন্ধুরা, জানুয়ারী আমাদের বনভোজনের মাস ছিলো—অনেকেই বেড়িয়েছো। হ্যাঁ, সুযোগ হয়েছিলো আমারও বেড়িয়ে আসার এমনি এক জায়গায় যাতে আল্লাহ্র আদেশ পালন ও নিদর্শন দেখার সৌভাগ্য এক সাথেই ঘটেছে (ভাগ্য ও সুযোগ এ জন্য বলছি যে, এমনটা বনভোজন উপলক্ষ্যে নয় বরং কুমিল্লার ইজতেমায় কেন্দ্রীয় অতিথি হয়ে

গিয়ে বাড়তি পাওনার মধ্যে ছিলো)। কুমিল্লায়, লালমাই ও ময়নামতি পাহাড়-শ্রেণীর মাঝামাঝি জায়গায় মাটি খুঁড়ে বের করা বিশাল শালবন বিহার। আকাশ ছোঁয়া অসংখ্য শাল গাছ থাকায় লোকমুখে প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারটির এমনটি নাম হয়েছে। পাওয়া প্রমাণাদি হতে জানা যায় দেব-রাজবংশের ৪র্থ রাজা ভবদেব আনুমানিক ৮ম শতাব্দীতে এটি নির্মাণ করেন। এর চারটির প্রতিটি বাহু ৫৫০ ফিট, প্রত্যেকটিতে ১১৫টি কক্ষ রয়েছে। জানা যায় সেকালে শিক্ষা-সভ্যতার পাদপিঠ ছিলো এটি। এখানে প্রাপ্ত মুদ্রায় গুপ্ত, আরাকানী ও চন্দ্রবংশীয় প্রভাব দেখা যায়। কোন অজানা কারণে পাহাড়ের নীচে তলিয়ে গিয়েছে —এ বিশাল বিহার? নিজের উপাসনার জন্যে বানানো প্রার্থনালয়টি রক্ষা করা দূরের কথা স্বয়ং বৌদ্ধ রক্ষক দেবতা 'হেরুকা'কেই মাটি খুঁড়ে ক্ষত বিক্ষত অবস্থায় বের করা হয়েছে ধ্বংস স্তূপের নীচ থেকে। "হায় মৃত দেবতা হেরুকা! তোমার ভক্তরা এতই বোকা।"

আসলে সবকিছুর নিরাপত্তাদাতা (মোমিন), সংরক্ষণকারী (মুকীত) ও ধ্বংসের পর পুনরুত্থানকারী (মুবীদ ও বায়েস) একমাত্র চিরঞ্জীবী ও চিরস্থায়ী (হাইয়ুন কাইয়ুম) আল্লাহ্‌ই। আমরা এই পৃথিবীতে কিছুদিন বেড়িয়ে শেষে আল্লাহ্‌র কাছেই ফিরে যাবো—তাই তাঁকেই সর্বোচ্চ ভালোবাসা ও ভয় করা প্রকৃত বুদ্ধিমানের কাজ। বন্ধুরা! তোমরা নিশ্চয় বুদ্ধিমানদের দলে।

পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচু চূড়ায় উঠে মনে হলো,—না, সেকালের কোন মানুষের গড়াভাঙ্গা স্থাপত্য দেখার জন্যে নয় বরং শৈল্পিক মনন স্রষ্টার অপরূপে সাজানো অনাবিল প্রকৃতির গন্ধ ও রঙের বিপুল আয়োজনের হাতছানি টানেই এখানে এতো মানুষ জড়ো হয় সব সময়। সারি সারি আম গাছে মুকুল হেসেছে—হাওয়ার গন্ধে একটা পাগল করা ডাক। পাহাড়ে ঘুরে ফিরে কাঁচা বড়ই খেয়ে খেয়ে মুখ টক করে ফেলেছি—এখনো স্রষ্টার প্রকৃতি এতো রুক্ষ ওখানে।

সারাক্ষণে আমার গাইড ছিলো সুমন—সে দেখালো ওদের ল্যাবরেটরী গভঃ হাইস্কুল, ছিমছাম কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজ, বার্ড (বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী), টেকনিক্যাল কলেজ। এছাড়াও কুমিল্লায় রয়েছে বৃহৎ আর্মি ক্যান্টনমেন্ট (ময়নামতী ব্যাটালিয়ন) ও রাণী ভিক্টোরিয়ার নামে একটি বিখ্যাত কলেজ।

হা হতোস্মি! কুমিল্লার ইজতেমা আর যাঁদের অতিথি হয়ে গেলাম? শালবন বিহারের নাতিদূরে নন্দনপুর আগেই অনেক সুনাম শুনেছিলাম তাঁদের—সেই নন্দিত সুগন্ধেই ছুটে যাওয়া। সবচেয়ে বেশী সুযোগ হয়েছিলো ছোটদের সাথে মেশার। লাবন্যের লোভন ফুলেরা যেমনটি-আহমদীয়াতের আদর্শের পিদিম প্রভায় তেমনি ঝক্‌মকে তারা। তাদের

দেখে জেনে চোখ আমার জুড়িয়ে শীতল হয়ে গেছে শান্তিতে, স্বস্তিতে। সুশীল, সুমন, মামুন, জহির, কাওসার, রুনা, শোহেল, নুসরত, রানা সবাই খুব সুন্দর করে কথা বলে, বুদ্ধির ছাপ রেখে বক্তৃতায় সুমনের সে কি বাগ্মিতা! লিখিত পরীক্ষায় ফরহাদতো আমার কলম থেকে ১০০ই নিয়ে নিচ্ছিলো। কুরআন তিলাওয়াত আর নযমের পেছনে তাদের যে কতো সাধ্য-সাধনা ছিলো বুঝে গর্বে আমার বুক ভরে উঠেছে। 'সং বচন' মাসিক দেয়া-লিকাটি আতফালেরাই প্রকাশ করে। নিয়মিত লেখক তিন ক্ষুদে বন্ধু আহমাদুর রহমান, আবুল আতা ও নাতিকুল ইসলাম সম্পাদনা, প্রকাশনা ও প্রচ্ছদ পরিকল্পনায় কোন খাদেমকে নেয়ার ওদের প্রয়োজনও যেন পড়ে নি। না বললেই নয় ইজতেমায় আরও সম্মানিত অতিথি ছিলেন হাফেয সেকান্দর আলী সাহেব। তাঁর নির্মল কৌতুক মাখানো গল্পের রসে সর্বদা হাসির যে বন্যা বচ্ছিলো তারই তোড়ে ছোটরা চোখের সামনে ভেসে যাচ্ছিলো।

ফিরতি পথে কলসী গলায় খেজুর গাছ সারি সারি। ঠাণ্ডা লেগে খেজুর গাছের নাক চোখ দিয়ে পানি পড়ছে, গা ভিজে যাবে বলেই যেন গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে ছোট কলস। হায়, যদি শুধু হাত থাকতো তাহলে নিশ্চয় গরম কাপড় খুঁজে নিতো। ছোট (৩/৪ ফুট) খেজুর গাছেও কলসী ঝুলানো দেখে শিশু-শ্রমের কথা মনে পড়ে গেল—দুঃখ ও রাগ হলো ভীষণ। ছোটরা পড়াশুনা করে জেনে শিখে দেখে বড়ো হবে আগে—তারপরে অন্যকথা। তাদের দিয়ে খাটা-খাটুনীর কোন কাজ করানো চলবে না—আহমদীয়া মুসলিম জামাতই সেটা নিশ্চিত করবে, ইনশাল্লাহ।

যেন আল্লাহ্‌র ফযলে ভালো থাকো সবাই। আবারো সালাম খোদা হাফেয।

তোমাদের 'ভাইয়া'
সেলিম খান

রক্তদান কর্মসূচী

কেন্দ্রের দেয়া বাৎসরিক প্রোগ্রাম মোতাবেক গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী বিকাল ৩ ঘটিকায় চট্টগ্রাম মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে এক রক্তদান কর্মসূচী পালিত হয়। চট্টগ্রামের লায়নস্ ক্লাব এই রক্ত সংগ্রহ করে। এতে প্রায় ১৩ ব্যাগ রক্ত প্রদান করা হয়। এই খবর কয়েকটি বাংলা ও ইংরেজী দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং ১৯শে ফেব্রুয়ারী সকাল ৭-৪৫ মিনিটে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকেও ঘোষণা দেয়া হয়। ২১শে ফেব্রুয়ারীর 'SUNDAY'-পত্রিকায় এ সংক্রান্ত খবর ছাপা হয়।

নাযেম খেদমতে খালক্, চট্টগ্রাম ম, খো, আ,

সংবাদ ঃ

কাযা বোর্ড

হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের জন্যে নিম্নলিখিত কাযা বোর্ডের অনুমোদন দান করেছেন।

১।	ডাঃ আবদস সামাদ খান চৌধুরী	চেয়ারম্যান
২।	জনাব শাহ মুস্তাফিজুর রহমান	ভাইস-চেয়ারম্যান
৩।	জনাব হাবিবুর রহমান	সদস্য-সচিব
৪।	ডাঃ এস, এ, আতাহার	সদস্য
৫।	এডভোকেট আবদুল মজিদ (ঢাকা)	সদস্য
৬।	,, তাইজউদ্দীন আহমদ (নারায়নগঞ্জ)	সদস্য
৭।	,, আহমদ আয়াতুর রহমান (গাজিতপুর)	সদস্য

অতি জরুরী পত্র আসাম ও পশ্চিম বঙ্গের পাঠকদের কাছে

আমরা নিয়মিতভাবে পশ্চিম বঙ্গ ও আসামের প্রায় ৫০টি স্থানে আহমদী পত্রিকা প্রেরণ করে থাকি, যার কোন চাঁদা গ্রাহকদের কাছ থেকে পাওয়া যায় নি। তবুও তবলীগের উদ্দেশ্যে আমরা এ যাবত ডাক খরচ সহ পত্রিকা ফ্রি পাঠিয়ে আসছি। এই সব পত্রিকা যথাস্থানে পেঁাছে কি-না তাও আমরা জানি না। তাই যারা পত্রিকা পান আগামী দুই মাসের মধ্যে তারা পত্র দিয়ে নির্বাহী সম্পাদককে জানাবেন। যাদের কাছ থেকে প্রাপ্তি সংবাদ আসবে না তারা পত্রিকা পান না বলেই মনে করব এবং তাদের নামে পত্রিকা পাঠান বন্ধ করে দেয়া হবে। —নির্বাহী সম্পাদক।

"রাষ্ট্র প্রধানরা তোমার বস্ত্র থেকে বরকত অনুসন্ধান করবে"।
ইলহাম ঃ মসীহে মাওউদ আঃ)

আলহাজ্ব স্যার সিঙ্গাতে

গাম্বীয়ার প্রাক্তন রাষ্ট্র প্রধান আলহাজ্ব স্যার সিঙ্গাতে। ইনি মসীহে মাওউদের (আঃ) বস্ত্র থেকে বরকত লাভ করেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

জাতীয় পাক্ষিক পত্রিকা রং বেরং-এর ১০ই মার্চ, ১৯৯৩ তারিখের সংখ্যায় সম্পাদকীয় পাঠ করে একটি বিষয়ের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। এ সম্পাদকীয়তে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর বিশিষ্ট সাহাবী হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) কে 'মুনাফেক' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পত্রিকার এ ধরনের মন্তব্য অতীত দুঃখজনক। এর নিন্দা করার ভাষা আমরা খুঁজে পাচ্ছি না।

হযরত মুয়াবিয়া কাতেবে ওহী অর্থাৎ আঁ-হযরত (সাঃ)-এর ওহীর লেখক ছিলেন। আঁ-হযরত (সাঃ) বলেছেন—আসহাবীয়া কান্নুজুম বেআইয়্যেমে একতাদাইতুম এহ্তাদাইতুম-অর্থাৎ আমার সাহাবাগণ নক্ষত্র স্বরূপ তাদের মধ্য থেকে যাকে অনুসরণ করবে তুমি হেদায়াত পেয়ে যাবে। তিনি সাহাবাদেরকে মন্দ বলতেও নিষেধ করেছেন—লা তাসুব্বু আসহাবী অর্থাৎ আমার সাহাবীকে তোমরা মন্দ বোলনা (বুখারী)। সাহাবীগণ কোন কোন মসলার ব্যাপারে হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর সিদ্ধান্তকে গ্রহণযোগ্য মনে করতেন।

সুতরাং সাহাবাগণকে আমরা সম্মানের সাথে স্মরণ করি এবং সকলকে পরামর্শ দেই যেন তারাও সবাই তাঁদের নাম সম্মানের সাথে নেন এবং এত দীর্ঘদিন পরেও তাঁদের সম্বন্ধে বিরূপ সমালোচনা না করেন।

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী
ন্যাশনাল আমীর

বাংলাদেশের সুপ্রিয় গ্রাহকবৃন্দ!

আপনারা যদি পাক্ষিক আহমদী পত্রিকা না পান তাহলে,—

১। নিজ নিজ পোষ্ট অফিসে খোঁজ করুন।

২। আপনার চাঁদার মেয়াদ শেষ হল কি-না অনুসন্ধান করুন।

৩। চাঁদার মেয়াদ শেষ না হয়ে থাকলে এবং ডাকে কোন গণ্ডগোল না থাকলে সরাসরি আমাকে লিখুন।

৪। পত্রিকা পোষ্ট করার দায়িত্ব যদিও সম্পাদকের নয়, তবুও অনুসন্ধান করে আপনাদের কাছে পত্রিকা পাঠাবার ব্যবস্থা করা হবে। আপনার চাঁদা আহমদী পত্রিকার রশিদে আদায় করুন। পূর্ণ ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখুন। ঠিকানা পরিবর্তন হলে সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরকে জানান।

৫। আহমদীর গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধিতে সহায়তা করুন এবং এর উন্নতির ব্যাপারে পরামর্শ দিন।

—নির্বাহী সম্পাদক

জিয়াউল হকের মৃত্যুর রহস্য ঃ অন্তর্ঘাত ?

"পাকিস্তানের একটি বিচার বিভাগীয় কমিশন ১৯৮৮ সালে এক বিমান দুর্ঘটনায় জেনারেল জিয়াউল হক ও অন্যান্য ঊর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তার নিহত হওয়ার ঘটনাকে 'অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা' বলে উল্লেখ করেছে। পিটিআই'র খবর।

পাকিস্তানের পত্রিকা ফ্রন্টিয়ার পোষ্ট' একটি সূত্রের উল্লেখ করে জানিয়েছে, দু'মাস-ব্যাপী তদন্তকালে কমিশনের কাছে পর্যাপ্ত প্রমাণাদি উপস্থাপিত না হওয়ায় এ অন্তর্ঘাতের জন্যে দায়ী কোনো ব্যক্তি বা সংগঠনকে কমিশন চিহ্নিত করতে পারেনি।

১৯৮৮ সালের ১৭ আগষ্টে ভাওয়ালপুরের সংঘটিত সি-১৩০ হারকিউলিস বিমান বিধ্বস্ত হওয়ার ঘটনাকে কমিশন দুর্ঘটনা নয় বলে উল্লেখ করেছে। এ ছাড়া কমিশন সাবেক সেনা প্রধান জেনারেল মীর্জা আসলাম বেগসহ অন্যান্য সন্দেহভাজন জেনারেলদের অব্যাহতি দিয়েছেন। কমিশনের একজন সিনিয়র জজ বলেছেন, প্রয়োজনীয় প্রমাণাদির অভাবে এ তদন্ত ছিল অন্ধকার সুড়ঙ্গ দিয়ে ভ্রমণের মতো"।

(১৩-২৩ তারিখের ভোরের কাগজ পত্রিকার সৌজন্যে)

মসীহ্ মাওউদ দিবস পালন করুন

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মার্চ লুধিয়ানার মহল্লা জাদীদের বাড়ীতে—সুফী আমহদ জান সাহেবের ঐতিহাসিক বাড়ীতে প্রথম বয়াত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যে অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছিল, হাঁটি হাঁটি পা পা করে তা-ই আজ বিশ্বের ১৩০টি রাষ্ট্রে ছড়িয়ে পড়েছে। এ দিনকে ঐতিহাসিক চিত্রপটে চির অম্লান রাখার জন্যে প্রতি বছর আহমদীয়া মুসলিম জামাত 'মসীহ মাওউদ' দিবস পালন করে থাকে। বাংলাদেশের স্থানীয় জামাতগুলোকে ঐ দিন অথবা পরবর্তীতে যেকোন সুবিধা জনক দিনে ঐ দিনটি পালন তথা সভা-সমিতি করে কেন্দ্রে রিপোর্ট পাঠাতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ঈদের শুভেচ্ছা বাণী

আসছে পবিত্র ঈদুল ফেতর উপলক্ষ্যে আমরা আমাদের অগণিত পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীগণকে জানাই ঈদের শুভেচ্ছা।

অনিবার্য কারণে পাক্ষিক আহমদীর ১৭ ও ১৮শ সংখ্যাদ্বয় একত্রে বর্ধিত কলেবরে বের করতে হচ্ছে। ৩১শে মার্চ-এর কোন সংখ্যা প্রকাশিত হবে না। পাঠকদের এ অনাকাঙ্খিত অসুবিধার জন্যে আমরা দুঃখিত।

পাক্ষিক আহমদী ব্যবস্থাপনা

সিরাতুন্নবী (সাঃ)-এর জলসা অনুষ্ঠিত

কুমিল্লা মজলিস

আল্লাহ্‌র অশেষ কৃপায় মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, কুমিল্লার উদ্যোগে নন্দনপুরে গত ২০/১/৯৩ ইং বাদ মাগরিব হতে ৩ ঘন্টা ব্যাপী সিরাতুন্নবী (সাঃ)-এর জলসার আয়োজন করা হয়।

সকল মানুষের জন্য অনুকরণযোগ্য আদর্শ হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় অংশ নেন সর্বজনাব মোহাম্মদ ইদ্রিস, মোহাম্মদ তানভীরুল হক, মোহাম্মদ আবদুস সালাম ও হাফেয সেকান্দর আলী, এবং সর্বশেষে সভাপতি ডাঃ আঃ আযীয সাহেব।

মোহাম্মদ ইকবাল চৌধুরী,
কায়েদ

লাজনা ইমাইল্লাহ চান্দপুর চা-বাগান

লাজনা ও নাসেরাত সমন্বয়ে ৫-৩-৯৩ইং তারিখ রোজ শুক্রবার সকাল ১০টা থেকে ১২টা পর্যন্ত সিরাতুন্নবী (সাঃ)-এর জলসা করা হয়। এতে সভাপতি ছিলেন স্থানীয় জামাতের লাজনা ইমাউল্লাহর প্রেসিডেন্ট সাহেবা। এই মহতি জলসায় হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে লাজনা ও নাসেরাতের সদস্যারা বক্তৃতা দেন।

মোহাম্মদ হুমায়ুন কবীর
(মোয়াল্লেম)

বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্‌ তা'লার অশেষ ফযলে গত ২৯শে জানুয়ারী, ১৯৯৩ তারিখ রোজ শুক্রবার বাজামাত তাহাজ্জুদ নামাযের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বার্ষিক ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয় চান্দপুর চা-বাগান মজলিসে।

দ্বিতীয় অধিবেশনে খোদ্দাম ও আতফালদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিযোগিতা হয়। প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তুর মধ্যে ছিল কোরআন তেলাওয়াত, নযম পাঠ, বক্তৃতা, দীনি মালুমাত (লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষা) এবং বিভিন্ন খেলাধূলা।

বাদ জুমুআ সমাপনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ হানিফ চৌধুরী (স্থানীয় প্রেসিডেন্ট)। এতে বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব মোশতাক আহমদ চৌধুরী, মোঃ ইকবাল আহমদ চৌধুরী তৌহীদুল ইসলাম (মোয়াল্লেম), মনোয়ার আহমদ (রিজিওনাল প্রতিনিধি), আনোয়ার হোসেন চৌধুরী (স্থানীয় কায়েদ)। পরে সভাপতির ভাষণ দেন জনাব মোঃ হানিফ চৌধুরী (স্থানীয় প্রেসিডেন্ট)।

তোফায়েল আহমদ চৌধুরী,
চেয়ারম্যান ইজতেমা কমিটি '৯৩

সালানা জলসা অনুষ্ঠিত

আহমদনগর জামাত

আহমদীয়া মুসলিম জামাত আহমদনগরের ১৬তম সালানা জলসা পূর্ব নির্দ্ধারিত তারিখ অনুযায়ী ১৯/২/৯৩ ও ২০/২/৯৩ যথাক্রমে রোজ শুক্র ও শনিবার আহমদনগর জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়। দু'টি অধিবেশন সম্বলিত এ জলসায় সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে স্থানীয় প্রেসিডেন্ট ও জনাব ভিজির আলী সাহেব, ন্যাশনাল আমীর (১ম)। উদ্বোধনী ও সমাপ্তি ভাষণ দান করেন মোহতরম মোহাম্মদ মোস্তফা আলী, ন্যাশনাল আমীর। বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব ভিজির আলী, অছিম উদ্দীন, মাওলানা বশীরুর রহমান, আবুল হাসেম, হাফেয সেকান্দর আলী ও এ, কে রেজাউল করীম।

এই জলসা অন্যান্য বছরের তুলনায় বহু দিক থেকে ভিন্ন ও একটি ঐতিহাসিক জলসা ছিল। এই জলসাতে হুযুর (আইঃ) কর্তৃক আহমদীয়া মুসলিম জামাত আহমদনগরকে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের মধ্যেমে একটি ডিস এনটিনা প্রদান করা হয়। বিভিন্ন জামাত থেকে প্রায় ১০০ জনের মত নন আহমদী অংশ গ্রহণ করেন, যাদের মধ্যে সাংবাদিক, চেয়ারম্যান, কমিশনার, মেম্বার ও শিক্ষিত সুধীবৃন্দ ছিলেন। এই জলসাতে আমরা প্রথম হুযুর (আইঃ)-এর লণ্ডন ফযল মসজিদে প্রদত্ত জুমার খুতবা ডিস এনটিনার মাধ্যমে সরাসরি দেখি। প্রথম অধিবেশনে উপস্থিতির সংখ্যা প্রায় ৮০০ জন এবং দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রায় ১০০০ জন। জলসায় মহিলাদের উপস্থিত যথাক্রমে প্রথম দিন ২০০ জন ও দ্বিতীয় দিন ৩০০ জন।

শরীফ আহমদ, প্রেসিডেন্ট

ভাতগাঁও জামাত

বিগত ১৮-২-৯৩ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ভাতগাঁও ৮ম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত করে। রোজ বৃহস্পতিবার যোহরের পর অনুষ্ঠিত জলসায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট ডাঃ মফিজ উদ্দিন আহমদ। অতিথি নায়েব ন্যাশনাল আমীর-১ম ভিজির আলী ও মোহতরম মোহাম্মদ মোস্তফা আলী ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ এর উপস্থিতিতে জলসার কার্যক্রম শুরু হয়। বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব ইসমাঈল আহমদ, মিজানুর রহমান মোয়াল্লেম, হাফেয সেকান্দর আলী, সদর মুরব্বী মাওলানা বশীরুর রহমান, নায়েবে আমীর-১ম ভিজির আলী, ও সমাপ্তি ভাষণ দান করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব।

এম, নূর উদ্দিন, জেলা কায়েদ-দিনাজপুর

তেরগাতি জামাতে নবনির্মিত মসজিদের শুভ উদ্বোধন

বিগত ইং ৫/২/৯৩ তারিখ রোজ শুক্রবার তেরগাতি জামাতের পাকা মসজিদ উদ্বোধন করা হয়। ঐ তারিখ জুমুআর নামাযের আযানের পর মসজিদের দরজার ফিতা কর্তন করে ন্যাশনাল আমীর জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেব ও তাঁর পিছনে হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ রাবে'র (আইঃ) বিশেষ প্রতিনিধিদ্বয় জনাব হাফেয মোজাফফর আহমদ এবং জনাব

আবদুর রহীম বেগ সাহেব ও অন্যান্য মুসল্লিগণ মসজিদে প্রবেশ করেন। জুমুআর নামাযের খুতবা পরিবেশন করেন জনাব হাফেয মোজাফর আহমদ সাহেব। এ বিষয়ে পরে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানও অনুষ্ঠিত হয়।

মোঃ নজরুল ইসলাম, তেরগাতী

মুসলেহ মাওউদ দিবস পালিত

দেরীতে পাওয়া খবরে জানা গিয়াছে যে, নিম্নলিখিত জামাতগুলোও শান ও শওকতের সাথে মুসলেহ মাওউদ দিবস পালন করেছেন—তেরগাতি, চান্দপুর চা-বাগান, সুন্দরবন, বিষ্ণপুর ক্রোড়া, গালিম গাজী ও খুলনা।

তালীম ও তরবীয়তি ক্লাশ অনুষ্ঠিত

বিভিন্ন মজলিসে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে তালীম ও তরবয়তী ক্লাস পরিচালনা করা হয়। এদের মধ্যে নাসেরাবাদ, বিষ্ণুপুর, কুমিল্লা ও সৈয়দপুর-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

আহমদী বার্তা

শুভ বিবাহ

গত ১২ই মার্চ, ১৯৯৩ইং রোজ শুক্রবার বাদ জুমুয়া দারুত তবলীগ মসজিদে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ এর সদর মজলিস মুসীয়ান ও সেক্রেটারী অডিও ভিডিও জনাব এ, কে, রেজাউল করীমের দ্বিতীয়া কন্যা মোসাম্মৎ তাহমিনা করীম ইয়াসমিনের বিয়ে জামালপুর শহরের (নোয়াপাড়া) মরহুম ওয়াসীম উদ্দিন আহমদ সাহেবের চতুর্থ পুত্র জনাব মোহাম্মদ রেজাউল্লাহর সাথে টা-৫০,০০১/- (মাত্র পঞ্চাশ হাজার এক টাকা) দেন মোহর ধার্যে এলান করা হয়। বিয়ের এলান করেন সিলসিলার মুরব্বী মাওলানা সালেহ আহমদ সাহেব। এ বিয়ে যাতে জামাতে আহমদীয়া ও এ দু'টি পরিবারের জন্যে বরকতপূর্ণ হয়, সেজন্যে জামাতের সকল ভাই ও বোনদের কাছে দোয়ার দরখাস্ত করা যাচ্ছে।

মোহাম্মদ মুতিউর রহমান
অফিস সেক্রেটারী,
আ, মু, জামাত, বাংলাদেশ

শোক সংবাদ

আমার শ্রদ্ধেয়া আম্মা জনাবা সুফিয়া আজহার গত ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯৩ইং রোজ সোমবার সকাল ৯ ঘটিকার সময় ইন্তেকাল করেন। (ইন্নলিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বৎসর। ভ্রাতা ও ভগ্নিগণের নিকট আমার আব্বার রূহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়ার আবেদন করিতেছি। চৌধুরী আতিকুল ইসলাম, যয়ীমে আলা, নারায়ণগঞ্জ

অদ্য ৮/৩/৯৩ ইং রোজ সোমবার রাত ৯-৩০ মিনিটে মোয়াল্লেম মুহাম্মদ আবু তাহের ইন্তেকাল করেন (ইন্না ... ...রাজেউন)। তিনি সম্ভবতঃ ১৯৩২ইং সনে বয়াত গ্রহণ করে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের অন্তর্ভুক্ত হন। তিনি সুদীর্ঘ ৩০ বৎসর যাবত মুয়াল্লেম পদে বহাল থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন জামাতে কাজ করেন। পঞ্চগড়ের আহমদনগর জামাতের স্থান তাঁর দ্বারাই নির্বাচিত হয়। তিনি মৃত্যুকালে চারপুত্র ও তিন কন্যা সহ বহু নাতি নাতনী ছেড়ে যান। আল্লাহতা'লা তাঁর রূহের মাগফেরাত দান করুন এবং তাঁর পরিবার পরিজনদের দান করুন সাবরে জামীল।

মাওলানা সালেহ আহমদ, সদর মুরব্বী

নারায়ণগঞ্জ জামাতের প্রবীন আহমদী জনাব আলী আহমদ কন্ট্রাক্টর সাহেব গত ২২শে ফেব্রুয়ারী সোমবার সন্ধ্যা ৬-৩০ মিঃ নারায়ণগঞ্জ আধুনিক হাসপাতালে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্না লিল্লাহে .....রাজেউন)। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, তিন ছেলে ও তিন মেয়ে রেখে গেছেন। মরহুমের নামাযে জানাযা পড়ান সদর মুরব্বী মাওলানা ফারুক আহমদ সাহেব। স্থানীয় অনেক গয়ের আহমদীও মরহুমের নামাযে জানাযায় শরীক হন।

তাঁর রূহের মাগফেরাতের জন্যে সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী। তাহের আহমদ (জুম্মা) নারায়ণগঞ্জ

মুসলিম টি, ভি আহমদীয়া দেখুন

প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যা—৭-১৫ মিনিট

রমযানে প্রতি শনি ও রবিবার সন্ধ্যা—৬-০০ মিনিট

"আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর কোণায় কোণায় পৌঁছাব।"

—ইলহাম : মসীহে মাওউদ (আঃ)।

সম্পাদকীয় ঃ

রমযানের সাধনায় সিদ্ধি লাভই ঈদ

রমযান অর্থ—উত্তাপ। মানুষের মধ্যে যে শৈত্যভাব জন্ম নেয় তা দূর করার জন্যই রমযানের আগমন। শীতলতা থেকেই শৈথিল্য। উত্তাপ শৈথিল্য দূর করে মানুষকে চাঙ্গা করে দেয়। রোযা শব্দটি ফার্সী অর্থ—দিন ব্যাপী কর্ম। আরবীতে বলা হয় সিয়াম। সিয়াম অর্থ—আল্লাহ্ যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকা। অর্থাৎ আল্লাহতা'লার আদেশ নিষেধ পালনে অভ্যস্ত হওয়াই সিয়াম সাধনার উদ্দেশ্য। আল্লাহ্ যদি বলেন 'খাও' তাহলেই খাব। আল্লাহ্ যদি বলেন 'খাবে না' তাহলে খাব না। এক কথায় আল্লাহ্র হুকুম মান্য করাই রোযার উদ্দেশ্য। শুধু না খেয়ে থাকার নাম রোযা নয়। ভুলে যদি কেউ পেট ভরেও খেয়ে ফেলে তবুও রোযা ভাঙ্গে না (বুখারী, মুসলিম)। আর দিকে না খেয়ে থাকলেই রোযা হয় না (বুখারী)। সফরে পবিত্র লোকের রোযা নেই (বুখারী, মুসলিম)। যে সফরে রোযা রাখে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে আবাসে রোযা রাখে না (ইবনে মাজা)। সফরে যে রোযা রাখে সে গুনাহ্গার (মুসলিম)। মহানবী (সাঃ) বলেছেন, সফরে রোযা ঐচ্ছিক (বুখারী, মুসলিম)। এর কারণ আল্লাহতা'লার হুকুম। আল্লাতা'লা বলেছেন, সফরে এবং পীড়িত অবস্থায় রোযা রাখবে না, অন্য সময়ে রাখবে (সূরা বাকারা)। এক কথায় আল্লাহ্ যখন রোযা রাখতে বলেন তখনই রোযা রাখতে হবে। আমার ইচ্ছা এবং সুবিধা মত রোযা রাখলে চলবে না। আল্লাহ্র ইচ্ছামত রোযা রাখতে হবে।

ঈদের দিন রোযা রাখা হারাম। কেন-না ঐ দিনে খাওয়া আল্লাহ্র হুকুম। কেউ যাতে না খেয়ে না থাকে সেজন্য ফিংরানা দিতে হবে। সবাই মিলে একমাস দিনের বেলা আল্লাহ্র হুকুমে খাব না। আবার সবাই মিলে একদিন আল্লাহ্র হুকুমে খাব। এইতো সিয়াম, এইতো ঈদ। ঈদ অর্থ যা বার বার আসে। মানুষ আনন্দকে বার বার পেতে চায় তাই এর নাম হয়েছে ঈদ।

মহানবী (সাঃ) বলেছেন, লিকুল্লে কাউমিন ঈদ—অর্থাৎ সব জাতিরই উৎসব আছে। তবে আমাদের উৎসব হল—হাযা ঈদুনা—অর্থাৎ এই ঈদ। অন্যদের উৎসব শুধু অহেতুক আনন্দ উল্লাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বড় দিনে খাওয়া দাওয়া, আলোক সজ্জা, আকণ্ঠ মদ্য পান করে মাতাল হয়ে যাওয়া। হিন্দুদের পূজোয় ঢাক, ঢোল, সানাই বাজিয়ে গান গাওয়া, কীর্তন করা। কিন্তু আমাদের উৎসব ভিন্নতর। সকলের জন্য খাদ্য বিতরণ করে আল্লাহ্র বিশেষ প্রার্থনা করাই ঈদের অনুষ্ঠান। ঈদের দিনে অতিরিক্ত নামায পড়তে হয়। ফিতরানা দিতে হয়। কুরবানী করতে হয়। আমাদের উৎসবে গান বাজনা নেই। কোন ইসরাফ বা অহেতুক কর্ম নেই। একমাস সিয়াম সাধনায় সিদ্ধি লাভের আনন্দে দু'রাকাত নামায পড়ে, স্রষ্টা রাব্বুল আলামীনকে সেজদা করে, তাঁর হুকুম পালনের অঙ্গীকার করে আমরা ঈদ পালন করে থাকি। সবাইকে ঈদ মোবারক।

—নির্বাহী সম্পাদক।

31st March, 1993 আহ্‌মদী রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর "আইয়ামুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেনঃ

"আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতা'লা ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া। আমরা ঈমান রাখি যে, ফিরিশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তা'লা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরী'অত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামা'তকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলায়হিমুস সালাম) এবং কিতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতা'লা এবং তাঁহার রসূল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুযুর্গানের 'ইজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামা'তের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাযেবীনা ওয়াল মুফতারিয়ীনা—"
অর্থাৎ সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারীদিগের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত।

(আইয়ামুস সুলাহ্ পৃঃ ৮৬-৮৭)

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
দূরালাপনীঃ ৫০১৩৭৯, ৫০২২৯৫

সম্পাদক ঃ মকবুল আহমদ খান
নির্বাহী সম্পাদক ঃ আলহাজ এ, টি, চৌধুরী

Published & Printed by Mohammad F.K. Molla at Ahmadiyya Art Press for the p oprietors, Ahmadiyya Muslim Jamat, Bangladesh 4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211 Phone : 501379, 502295

Editor : Moqbul Ahmad Khan
Executive Editor : Alhaj A. T. Chowdhury